”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

রম্যরচনা

বাঙালিবাবু : স্বদেশ ও বিদেশে

আমেরিকায় আমার এক বন্ধু একবার আফসোস করে বলেছিলেন, আমাদের এখানে সকাল বলে কিছু নেই। আমরা সকাল দেখতে পাই না। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছুটতে হয় বাথরুমে। কোন রকমে দাড়ি কামানো আর স্নান সেরে বেরিয়েই গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে গলায় টাই বাঁধতে হয়। তারপর এক-দেড় ঘণ্টা প্রতিদিনের একঘেয়ে পথে গাড়ি চালিয়ে গিয়ে অফিসে ঢুকে পড়া। রবিবারগুলোতে ঘুম উসুল করি, দশটা-এগারোটার আগে বিছানা ছাড়ি না, ওঠার পরই বাগানে গিয়ে ঘাস কাটতে হয়।

সেই তুলনায় কলকাতার বাঙালিবাবুরা রোজই লম্বা একটা সকাল উপভোগ করেন। বিছানায় শুয়ে শুয়েই তাঁরা চা খান। নিজের হাতে বানাতে হয় না, স্ত্রী কিংবা কাজের লোক চা এনে দেয়। সঙ্গে চাই নোনতা বিস্কিট, মিষ্টি বিস্কিট হলে চলবে না, তাতে চায়ের স্বাদ খারাপ হয়ে যায়। চা পান করতে করতে বাঙালিবাবু অন্তত দু'খানা খবরের কাগজ পড়বেন, ইংরেজি ও বাংলা। এরপর বাথরুমে যাবার আগে তাঁর দ্বিতীয় কাপ চা চাই। এরপর তিনি বাজার করতে যাবেন। আজকাল প্রায় সব বাঙালিই প্যান্ট-শার্ট পরেন, কিন্তু এখনও বাজারের পোশাক লুঙ্গি কিংবা পা-জামা পাঞ্জাবি। প্রথমেই মাছের বাজারে গিয়ে আগে সব কটি স্টল তিনি ঘুরে দেখবেন। মাছ কেনার চেয়েও মাছ দেখাতেই তাঁর আগ্রহ বেশি। বড় সাইজের চিংড়ি মাছ কেনার সাধ্য আজ অধিকাংশ বাঙালিরই নেই, তবু বাজারে গিয়ে চোখের দেখায় কিছুটা আশ মেটে। তরকারির বাজারে অতিরিক্ত ব্যয় করে ফেলবেন তিনি। পছন্দ হয়েছে বলেই হয়তো এত বড় একটা লাউ কিনে ফেললেন, যেটা তাঁর ছোট পরিবারের পক্ষে অনেক বেশি। মাছখেকো বলে বাঙালিদের নাম আছে, আসলে বাঙালিরা কিন্তু তরকারিও বেশি খায়। ভাত আর মাছের ঝোলের মাঝখানে ডালের সঙ্গে অন্তত একটা কিছু ভাজা ও একটা তরকারি অবশ্যই চাই, এবং শেষ পাতে টক বা চাটনি।

বাজার করার সময় আসল মজা হচ্ছে চেনা-পরিচিত লোকদের সঙ্গে দু'চার মিনিট দাঁড়িয়ে গল্প করা। এই সময় অনেক খবর ও গুজবের বিনিময় হয়। কোনদিন তেমন কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা না হলে বাঙালিবাবু কোন মাছওয়ালা কিংবা তরকারিওয়ালার সঙ্গেই কিছুক্ষণ রাজনীতির আলোচনা সেরে নেন। বাড়িতে ফেরার পর স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তার জন্য আধ ঘণ্টা বরাদ্দ থাকে। কোন কোন দিন বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে দর্শনার্থীরাও আসে। এই সব সারা হলে বাঙালিবাবুটি বাথরুম খালি করে দেবার হুকুম জানাবেন, অর্থাৎ এইবার শুরু হবে অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুতি।

কানাডায় আমার এক অধ্যাপক বন্ধু একটি মজার গল্প শুনিয়েছিলেন। একদিন তাঁর বাড়িতে জলের কল খারাপ হয়ে যায়, বাথ-টাব উছলে জল মেঝেতে গড়াতে থাকে। সেই জল যদি বাড়ির বাইরে রাস্তায় গিয়ে পড়ে তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি অনেক টাকা ফাইন করে দেবে। বন্ধুটি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি একটি কলের মিস্তিরিকে ফোন করেন। মিস্তিরিটি আসতে রাজি হলেন এবং জানালেন, এখন সময় নটা চল্লিশ, নোট করে রাখুন। অর্থাৎ ঐ সময় থেকে

মিস্তিরিটিকে কাজে নিযুক্ত করা হল। মিস্তিরিটি অবশ্য নিজের গাড়ি চালিয়ে এসে পড়লেন এগারো মিনিটের মধ্যে। তারপর চটপট নিপুণ হাতে অনেক কিছু খুলে ফেলে এবং জোড়া লাগিয়েও ফেললেন, সব ঠিক হয়ে গেল। পকেট থেকে একটা ক্যালকুলেটর বার করে হিসেব করে বললেন, সাঁইত্রিশ মিনিট লেগেছে, আমার মজুরি তিনশ সত্তর ডলার। বন্ধুটি খাতায় মুখে চেক কাটতে কাটতে মিস্তিরিটিকে বললেন, দ্যাখো ভাই, তোমাদের কত সুবিধে। আমি কলেজে সারা মাস পড়িয়ে মাত্র তিন হাজার ডলার মাইনে পাই, আর তুমি এইটুকু সময়ে কত টাকা রোজগার করে ফেললে। মিস্তিরিটি হাসতে হাসতে বললেন, তা তো আমি জানিই। আমিও ফিজিক্সের অধ্যাপক ছিলাম। এই জন্যই অধ্যাপনা ছেড়ে কলের মিস্তিরি হয়েছি।

আমার বন্ধুটি তারপর থেকে বই পড়ে কল সারাবার কাজ, ফ্রিজ সারাবার কাজ, বাড়ি রং করার কাজ ইত্যাদি অনেক কিছু শিখে নিয়েছে। একদিন দেখি সে প্যান্ট গুটিয়ে, খালি গায়ে, বাড়ির তিনকোনা ছাদে উঠে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকছে।

কলকাতায় ঐ বন্ধুটির সমপর্যায়ের কোন বাঙালিবাবু নিজের হাতে এক গেলাস জলও গড়িয়ে খান না। একটা বাল্‌ব খারাপ হয়ে গেলে, বদলাবার জন্য লোক ডাকতে হয়। ফিউজ তার কেটে গেলে তো মিস্তিরি লাগবেই। খাওয়ার পর নিজের হাতে থালা-গেলাস তুলে নিয়ে যাওয়া এবং নিজের বাসন মাজা তো অকল্পনীয় ব্যাপার। অথচ এই বাঙালিরাই বিদেশে গেলে সব কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এদেশে জীবনে যে কখনও রান্নাঘরে ঢোকেনি, বিদেশে থাকতে গিয়ে সে-ই খিচুড়ি ও ইলিশ মাছের ঝোল রাঁধতে শিখে যায়। এদেশে কারুর বাড়িতে অতিথি এলে বাঙালিবাবু তাদের সঙ্গে বসে গল্প করবেন, ভেতর থেকে কাজের লোকেরা মিষ্টির প্লেট আর চা-কফি দিয়ে যাবে। বাড়ির কর্তা অতিথির মতনই বসে থাকবেন। নিজে একটা প্লেট এগিয়ে দিয়েও সাহায্য করবেন না।

এর ব্যতিক্রম দেখেছিলাম অক্সফোর্ডে নীরোদ সি চৌধুরীর বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার পর তিনি উঠে গিয়ে কয়েকটি প্লেটে কেক-পেস্ট্রি সাজিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর বয়েস তখন চুরানব্বই বছর, তাঁকে সাহায্য করার জন্য আমরা শশব্যস্ত হয়ে ছুটে যেতেই তিনি ধমক দিয়ে বললেন, বসুন তো গিয়ে। অতিথিরা নিজেরাই খাবার তুলে নেবে, নিজেরাই বাসন মেজে দিয়ে যাবে। এসব বিলিতি বাঁদরামি আমি পছন্দ করি না। বাড়িতে অতিথি এলে গৃহস্বামী কিংবা গৃহকর্ত্রী নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করবেন, এটাই বাঙালি ভদ্রতা। আমার স্ত্রী অসুস্থ, তাই তিনি আসতে পারছেন না।

নীরোদ সি চৌধুরী অন্য সময় পাক্কা সাহেব। বিভিন্ন ধরনের ওয়াইন সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। শুনেছি, বাড়িতে একা একা ডিনার খাবার সময়েও তিনি থ্রি পিস সুট পরে থাকেন। বিলিতি আদব-কায়দা খাস বিলেতের অনেক সাহেবরই ভুলে গেছে, তারা নিরোদ সি চৌধুরীর কাছে শিখতে পারে। কিন্তু বহুকাল প্রবাসী হয়েও বাড়িতে বাঙালি অতিথি এলে তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে দেখা করেন এবং কথাবার্তায় বাংলা ছাড়া একটিও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন না।

ওয়াইনের প্রসঙ্গে মনে পড়ল, কলকাতার মদের দোকানগুলিকে 'ওয়াইন শপ' বলা হয় বটে, কিন্তু এখানে ওয়াইন কালচারের বিশেষ চল নেই। বাঙালিবাবুদের মধ্যে মদ্যপানের রীতি গত শতাব্দী থেকেই চলে আসছে। দু'এক দশক আগেও মধ্যবিত্ত বাঙালিরা নিজের বাড়িতে মদ্যপান করত না, বার কিংবা ক্লাব থেকে পান করে ঈষৎ ফুরফুরে অবস্থায় বাড়িতে ফিরত। এখন সেই রাখা-ঢাকাও দূর হয়ে গেছে, এখন অনেক বাড়িতেই সন্ধে সাতটার পর কোন অতিথি এলে আর চা-কফির প্রস্তাব দেওয়া হয় না, মদের বোতল বেরিয়ে আসে। বাঙালিরা কোন অদ্ভুত কারণে বাংলা মদ শব্দটা উচ্চারণ করে না, বলে ড্রিঙ্কস। ড্রিঙ্কস বলতে বোঝায় হুইস্কি বা রাম। এত বেশি হার্ড ড্রিঙ্কস আর কোন শহরে পান করা হয় কিনা তাতে সন্দেহ

আছে। এদেশের হুইস্কি-ব্র্যান্ডি-রাম জাতীয় পানীয়কে বলা হয় 'ইন্ডিয়ান মেড ফরেন লিকার'। যেটা আসল ফরেন লিকার, সেই স্কচ হুইস্কির প্রতি বাঙালিবাবুদের দারুণ দুর্বলতা। প্রিমিয়াম স্কচ হুইস্কি এদেশে সুলভ নয়, দৈবাৎ কেউ এক বোতল জোগাড় করলে সে কথা গর্বের সঙ্গে বন্ধুদের বলে। এমনও দেখেছি, কেউ অর্ধেক খালি হওয়া একটা স্কচের বোতলে দিশি মদ মিশিয়ে সবটাই স্কচ হিসেবে অতিথিদের পরিবেশন করে। অবশ্য এই ধরনের ভণ্ডামি আমাদের জাতীয় চরিত্রেই মিশে আছে। ন্যাশনাল প্যাসটাইম-ও বলা যেতে পারে।

বাঙালিদের পোশাকের খুবই পরিবর্তন ঘটে গেছে গত কয়েক দশকে। মেয়েদের শাড়ির বদলে এসে গেছে শালোয়ার-কামিজ। পুরুষদের ধুতি প্রায় অদৃশ্য। বিবাহ কিংবা বিশেষ বিশেষ উৎসবে এখনও মেয়েদের শাড়ি ও পুরুষদের ধুতি-পাঞ্জাবির প্রচলন টিকে আছে। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। আয়ওয়া শহরে এক জোড়া বাঙালি ছেলেমেয়ের এক চার্চে বিয়ের অনুষ্ঠানেও অন্য বাঙালিরা ধুতি ও শাড়ি পরেছিল। সুভাষ বসুর ভাইয়ের ছেলে, ডক্টর শিশির বসুর মেয়ে শর্মিলার বিয়ে হয় হয় একটি ইংরেজ ছেলের সঙ্গে, এই কলকাতায়, হিন্দু মতে। সেখানে বরের বন্ধু কয়েকজন ইংরেজ যুবকও অনেকের দেখাদেখি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছিল। টরেন্টো শহরে একবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে চার-পাঁচ হাজার বাঙালিকে দেখেছি। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল একটা বড় হোটেলে। দূর দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে জিনস ও টি শার্ট পরা বাঙালি নারী-পুরুষ এসেছিল। প্রায় প্রত্যেকেই সঙ্গে করে ধুতি ও শাড়ি নিয়ে এসেছে। এক সঙ্গে অত ধুতি পরা বাঙালি আমি কলকাতাতেও ইদানীং দেখিনি।

উৎসব ছাড়া অন্য সময় পুরুষরা এখন প্যান্ট কিংবা কুর্তা-পাজামা পরে। কিন্তু গায়ক-গায়িকাদের এখনও ধুতি ও শাড়ি ছাড়া অন্য পোশাক নিষিদ্ধ। বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক সুবিনয় রায় গ্রীষ্মে প্যান্ট-শার্ট ও শীতকালে সুট পরেন কিন্তু মঞ্চে গান গাইবার সময় তাঁকে ধুতি পরতেই হবে। এ ব্যাপারে আমার একটা অজ্ঞতার অভিজ্ঞতার কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর সময় মহাজাতি সদনের একটি অনুষ্ঠানে তরুণ কবিদের দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়াবার একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। একলা গাইবার সাহস নেই, আমরা পাঁচ ছ'জন একসঙ্গে কোরাস গান শুরু করেছিলাম। দু'এক লাইন গাইবার পরই দর্শকদের মধ্যে একটা গুঞ্জন শোনা গেল, ক্রমে সেটা গোলমালে পরিণত হল। শ্রোতারা আপত্তি জানাচ্ছে। আমরা বেশ বিস্মিত হয়েছিলাম, খুব একটা খারাপ তো গাই না, সুর এবং কথা ঠিকই আছে, তবু লোকে শুনতে চাইছে না কেন? শেষ পর্যন্ত শ্রোতারা গালাগালি দিতে লাগল এবং কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ভাঙল। তাড়াতাড়ি পর্দা ফেলে দিয়ে উদ্যোক্তারা আমাদের পেছনের দরজা দিয়ে বার করে দিয়ে মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচালেন।

পরে শুনেছি, আমরা সবাই প্যান্ট-শার্ট পরে ছিলাম বলেই শ্রোতারা আমাদের গান সহ্য করতে পারেনি। ওরকম পোশাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া নাকি দারুণ অপরাধ। শ্রোতারা অনেকেই কিন্তু প্যান্ট-শার্ট পরে থাকে। অর্থাৎ ঐ পোশাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যায়, কিন্তু গাওয়া চলবে না।

আজকাল পুজো-আচ্চা নিয়ে অনেক বাঙালিবাবুই মাথা ঘামান না। পুজো প্যান্ডেলের কর্তাব্যক্তিরা ছাড়া অধিকাংশ কলকাতার বাঙালিরা এই সময়টা বাইরে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা করেন। এক সময় সপরিবারে দেওঘর-মধুপুর-পুরীতে গিয়ে মাসখানেক কাটিয়ে আসার চল ছিল। বাঙালির প্রিয় কাশ্মীর উপত্যকাও এখন অগম্য। এখন সবাই যায় কাঠমণ্ডু, ভুটান, কুলু-মানালি, কিংবা আরও দূরে, প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্কে। অনেকেরই ছেলে বা মেয়ে, ভাই বা বোন, কাকা বা মামা কেউ একজন ওসব দেশে থাকে, বিনা পয়সায় থাকার জায়গা জোগাড় করতে পারলে ভাড়াটা খুব একটা সমস্যা নয়। আর ঐ সব দেশে যে-সব বাঙালিরা বহু বছর ধরে আছে, তারা কিন্তু পুজো-আচ্চা সম্পর্কে খুবই আগ্রহী। এখানে পশ্চিম

বাংলার হিন্দু বাঙালিদের কথাই বলা হচ্ছে, মুসলমান বাঙালিরা ধুমধাম করে পালন করে ঈদ ও নববর্ষ।

ইওরোপ-আমেরিকায় দুর্গাপুজো হয় খুব নিষ্ঠার সঙ্গে, তবে পুজোর তারিখ কেউ মানে না। শনিবার ও রবিবার ছাড়া যে সে উৎসবে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। কোন কোন জায়গায় একই দিনে চারদিনের পুজো সেরে দেওয়া হয়, শেষে এক শনিবারে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী—চার ঘণ্টা পরে পুজো শেষ, ক্যাসেটে বাজানো হয় বিসর্জনের বাজনা। মেয়েরা ভক্তি ভরে বেনারসি শাড়ি পরে খিচুড়ি ভোগ রান্না করে।

আমেরিকার একটি ছোট শহরের বাঙালিরা একবার দুর্গাপূজা শুরু করার প্রস্তাব নিয়ে কিছুটা মুশকিলে পড়েছিল। পুরুত কোথায় পাওয়া যাবে? ঘোষ-দাস-মজুমদার-বসু-মিত্র-সেনগুপ্ত অনেক আছে, একজনও ব্রাহ্মণ নেই। অনেক খোঁজ নিয়ে জানা গেল, একটা কমপিউটার ফার্মে এসে সদ্য যোগ দিয়েছে এক চক্রবর্তী। ধরা হল গিয়ে তাকে। সে বেচারির জন্ম এবং পড়াশুনো পাঞ্জাবে। বাংলা জানে ভাঙা ভাঙা, জীবনে একটি সংস্কৃত অক্ষর উচ্চারণ করে নি, তার বাবা-কাকারাও ধুতি পরেননি কখনও। নামেই বাঙালি, আসলে পাক্কা সাহেব। তাকেই জোর করে পুরুত সাজানো হল। নিউ ইয়র্ক থেকে ফ্যাক্স মারফত আনানো হল পুজোর মন্ত্র, টোন সুতো দিয়ে বানানো হল পৈতে, বউদি স্থানীয় মহিলারা সেই চক্রবর্তী সাহেবকে ধুতি পরিয়ে দিলেন, কোথা থেকে একটা নামাবলিও জোগাড় হয়ে গেল। সেই অবস্থায় ছবি তুললে চক্রবর্তীর মাও বোধহয় তাকে চিনতে পারবেন না।

ওদেশে অনেকে বাড়িতে সরস্বতী পুজো করেন, সত্যনারায়ণের সিন্নিও দেন। কলকাতার বাঙালিরা যা পরিত্যাগ করেছে, বিদেশের বাঙালিরা এখনও তার অনেক কিছু ধরে রাখতে চায়। মুশকিল হয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সরস্বতী পুজোর সময় উপোস করে অঞ্জলি দিতে বাধ্য করলে তারা নাকি সুরে আপত্তি জানাতে জানাতে মেনে নিলেও তারা পুজোর প্রসাদ কিছুতেই খেতে চায় না। অতি কষ্টে সংগ্রহ করা বাতাসা, ফুটকড়াই ও শুকনো খেজুর মুখে দিয়ে তারা থু-থু করে ফেলে দেয়। তারা হ্যামবার্গার, হ্যামবার্গার বলে চ্যাঁচায়। সারা সকাল না খেয়ে থেকেছে। তাদের হ্যামবার্গার দিতেই হবে। সুতরাং বসবার ঘরে সরস্বতী পুজো চলতে থাকে। পাশের রান্না ঘরে হ্যামবার্গার ভাজা হতে থাকে। ধূপের গন্ধ ছাড়িয়ে সেই গন্ধই ম ম করে।

পুজো করতে করতে পুরুষ মশাইটিও উতলা হয়ে পড়েন। কারণ, অন্য ঘরে তার বন্ধুরা কারুর একটি নতুন কেনা বি এম ডব্লু গাড়ি সম্পর্কে আলোচনায় মেতে উঠেছে। ঐ রকম লোভনীয় আলোচনা ছেড়ে সংস্কৃত মন্ত্র পড়তে কার ভাল লাগে? তাড়াতাড়ি পুজো শেষ করে ঘণ্টা নাড়িয়ে দিলে তিনি শ্রান্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, গলা শুকিয়ে গেছে, আমাকে একটা বিয়ারের বোতল দাও।

একটু বাদেই ঘর ফাঁকা হয়ে যায়, সরস্বতী মূর্তি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

❑

প্রবন্ধ

কবিতার জন্ম

দুঃখই কবিতার জননী।

এই পৃথিবীর প্রথম কবিতা উৎসারিত হয়েছিল এক দুঃখিত ঋষির হৃদয় থেকে। তিনি অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত এক প্রণয়দৃশ্য দেখে শোকার্ত হয়েছিলেন।

পৃথিবীর কোন দেশে কবে কখন প্রথম কবিতা রচিত হয়েছিল সে ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক আলোচনায় আপাতত আমাদের গিয়ে কাজ নেই। এমন-কি রামায়ণের আগেই মহাভারতের সৃষ্টি হয়েছিল কিনা অথবা বেদ অপৌরুষেয় কিনা সে-প্রসঙ্গেও আমরা যাব না। আমরা বহুকাল যাবৎ ধ'রেই নিয়েছি যে বাল্মীকিই মনুষ্য সমাজের আদি কবি, তাঁর মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল প্রথম কবিতা বা শ্লোক। কবিতা রচনার ব্যক্তিগত ইতিহাসও বাল্মীকিই প্রথম আমাদের জানিয়েছেন। সেই ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা, তবু তার একটু বিশ্লেষণ করা যাক। মহৎ বিষয় বারবার স্মরণে কোনো দোষ নেই। আমরা সেই বর্ণনার প্রতিটি শব্দের ভিতরের অর্থে প্রবেশ করব।

নারদের কাছে প্রথম রামায়ণ কাহিনী শোনেন বাল্মীকি। নারদের কোন কবিত্ববোধ নেই। তিনি জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, 'এ-পৃথিবীতে বহুরকমের গুণবান্ মানুষ কে আছেন?' উত্তরে নারদ গড়গড় ক'রে অতি সংক্ষেপে, মাত্র শ-খানেক স্তবকে সমগ্র রামায়ণের কাহিনী শুনিয়ে দিলেন। যদি পরে বাল্মীকি না-লিখতেন, তাহলে ঐ নারদ-কথিত রামায়ণ সম্পর্কে আমাদের কোনো আগ্রহ থাকত না।

এই কাহিনী বাল্মীকির চিত্তেও কোনো দাগ কাটেনি প্রথমে। তিনি একটিও মন্তব্য করলেন না। কোনোরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না তিনি, এমন-কি এ-কথাও বললেন না, যা শুনতে চেয়েছিলাম, এই তো সে-রকম মানুষের কাহিনী। তিনি নারদকে যথাবিহিত পুজো-অর্চনা করলেন, কিন্তু ঐ-কাহিনী বিষয়ে আর কোন কথাবার্তা হ'ল না। নারদ বিদায় নেওয়ার পর তিনি তমসা নদীতে স্নান করতে গেলেন। সঙ্গে তাঁর শিষ্য ভরদ্বাজ। নদীতীর কর্দমশূন্য দেখে তিনি প্রীত হলেন এবং স্বচ্ছ জল 'সচ্চরিত্র মানুষের চিত্তের ন্যায়' এই উপমা তাঁর মনে এল। সম্ভবত রাম সম্পর্কেই তিনি এ-কথা ভেবেছিলেন এবং উপমাটিও এমন-কিছু আহামরি নয়। যাই হোক, তিনি ভরদ্বাজকে বললেন, আমাকে বল্কল দাও আমি স্নান করব।

বল্কল হাতে নিয়েও কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ স্নানে প্রবৃত্ত হলেন না। স্বচ্ছ জল দর্শনের পর থেকেই রামের কাহিনী তাঁর মনের মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। তিনি শুনতে চেয়েছিলেন একজন মহৎ এবং সর্ব অর্থে গুণবান্ মানুষের কথা, কিন্তু যাঁর কথা শুনলেন তাঁর জীবন অত্যন্ত জটিল এবং বহুরকম দুঃখে ভরা। তিনি তমসা নদীর তীর ধরে হাঁটতে শুরু করলেন এবং অন্যমনস্কের মত বেড়াতে লাগলেন নিবিড় অরণ্যে। সেখানে দুটি ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চী, অর্থাৎ কোঁচবক-এর মধ্যে পুরুষটির মাথায় তামার রঙের ঝুঁটি—এরা দু জনে মধুর শব্দ করতে-করতে সুস্থ শরীরে বিহার করছিল। অকস্মাৎ বাল্মীকি দেখলেন, পুরুষ পাখিটি এক নিষাদের তীরে বিদ্ধ হয়ে রক্তমাখা অবস্থায় ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল। আর যে নারী

পাখিটি একটু আগে মধুর স্বরে গাইছিল সে উচ্চস্বরে রোদন করে উঠল। সেই স্বর শুনে বাল্মীকির মনে হল, ঐ তাম্রশীর্ষ, কামমোহিত, সুদর্শন পুরুষ পাখিটির সঙ্গে আর কোনদিন মিলন হবে না বলেই নারী পাখিটি কাঁদছে। সম্ভোগ-প্রবৃত্ত বিহঙ্গকে এ-রকমভাবে নিহত হতে দেখেই বাল্মীকি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখ থেকে অভিশাপ বেরিয়ে এল।

নিষাদের ধর্মই শিকার। সুতরাং ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে-ব্যাধ পক্ষী শিকার করছে, তাকে অভিশাপ দেওয়া কোনো মুনি-ঋষিরও সাজে না! সম্পূর্ণ হিংসা পরিত্যাগ করার কথা আমাদের শাস্ত্রকাররা কখনও বলেননি। হরিণ তাড়া-করে-আসা রাজা দুষ্যন্তকেও কণ্বমুনির আশ্রমবাসীরা শিকার করতে নিষেধ করেননি, শুধু বলেছিলেন আশ্রমের মধ্যে জীবহত্যা করবেন না। নিষাদদের সম্পর্কেও বাল্মীকির কোন ক্রোধ ছিল না। নিষাদরাজ গুহককে তিনি মহৎ চরিত্র হিসেবে এঁকেছেন, যে গুহক শিকারলব্ধ শুকনো মাংস দিয়ে রাম প্রভৃতিকে সমাদর করতে চেয়েছিলেন। এমন-কি রামায়ণের রামও বনবাসের সময় আহারের জন্য পশু শিকার করেছেন। সুতরাং সম্ভোগে ব্যাপৃত হরিণযুগলের একটিকে হত্যা করে মহারাজ পাণ্ডু যে-অন্যায় করেছিলেন, এখানে বাল্মীকির চোখে এই ব্যাধেরও সেই অপরাধ। তিনি অভিশাপ দিয়ে বললেন, 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ'—'রে নিষাদ তুই শাশ্বতকালেও প্রতিষ্ঠা লাভ করবি না।' পাছে নিষাদটি এই অভিশাপের মর্ম বুঝতে ভুল করে—অকারণ অভিশাপ দিলে ঋষিদেরও তার প্রতিফল ভোগ করতে হয়—তাই বাল্মীকি তৎক্ষণাৎ তার কারণটিও জানিয়ে দিলেন, 'যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্'—'তুই ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে কামমোহিত অবস্থায় বধ করেছিস।'

অভিশাপটি আপাতদৃষ্টিতে খুব সাঙ্ঘাতিক নয়। দুর্বাশা বা অন্য কোন কোপনস্বভাব ঋষির সামনে পড়লে নিষাদটি আরও অনেক কঠিন শাস্তি পেত। অন্তত 'তুই-ও তোর পত্নীর সমক্ষে এ-রকমভাবে নিহত হবি'—এইধরনের অভিশাপ পুরাণগুলিতে অহরহ দেখা যায়। মৃগরূপী ঋষি মহারাজ পাণ্ডুকে এইজাতীয় অভিশাপই দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্বাশা ও অপরাপর অভিশাপ প্রদানকারী ঋষিরা কেউ কবি নন, এবং বাল্মীকিও আর কখনও কারুকে অভিশাপ দেননি। এখানেও তিনি নিষাদটিকে মৃদু ধমক দিয়েছেন মাত্র, তার জীবন বা অঙ্গহানি, এমন কি তার জীবিকাহানির কথাও বলেননি। শুধু বলেছেন, তুই কোনদিন প্রতিষ্ঠা পাবি না। রাজশেখর বসু ব্যাখ্যা করেছেন, প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার অর্থ চিরকাল পতিত থাকা। কিন্তু যে চতুর্বর্ণ সমাজে নিষাদ একেবারে নিচের তলায়, সে আর কতটা পতিত হবে? সুতরাং এই সব অর্থ ছাড়িয়েও ঐ প্রতিষ্ঠা শব্দটির জন্যই অভিশাপটি কবিতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। এবং প্রতিষ্ঠা শব্দের এ-পাশে এবং ও-পাশে প্রতিটি শব্দের ব্যঞ্জনা আমাদের এক মুহূর্তে কবিতাকে চিনিয়ে দেয়। বুঝতে পারি, এ কারুর মুখের কথা না, কাজের কথা নয়, এর ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ নতুন। আমাদের আদিকবি রচিত প্রথম কবিতা, বলা যায়, এখনও আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

কবিত্বশক্তি কি এ-রকম আচম্বিতেই আসে? কোন-কোন মুহূর্তের স্বতোৎসারিত বাক্যই কাব্য হয়ে যায়? মনের গহনে কোন রহস্যালোকে অবস্থান করে কিছু-কিছু উপলব্ধি, যা সুনির্দিষ্ট বাক্যবন্ধ ছাড়া কিছুতে আত্মপ্রকাশ করে না? কবিকে হতে হয় না অনুশীলনকারী? এ-সব প্রশ্নেরও উত্তর আমরা অচিরেই পাব।

নারদের মুখে শোনা নীরস রামচরিত বাল্মীকি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি। সমস্ত গুণের আধার হয়েও যিনি সারাজীবন বহু দুঃখ ভোগ করলেন, সেই রাম নামক একজন অতিমানবের কথা তাঁর মনের মধ্যে এমন এক রসে জারিত হচ্ছিল যার নাম মমতা। যখন অপরের বা বাইরের কোন দুঃখ দেখে স্রষ্টারও দুঃখ বোধ হয় এবং একই সঙ্গে মনে হয়, এই দুঃখ আমার, তখন তা কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে যায়। রাম এখানে বাল্মীকির অবলম্বন। তিনি কর্দমশূন্য নদীতীরে এবং নির্মল স্বচ্ছ জল দেখেও সেইরকম মানুষের কথাই ভাবলেন। হাতে

বল্কল নিয়েও তিনি স্নানে নামলেন না। নিরীক্ষণ করতে লাগলেন নিবিড় বন, যে-রকম এক বনে রাম সীতাকে নিয়ে পরম সুখে ছিলেন এক পর্ণকুটিরে। রাম-সীতার জীবনে সবচেয়ে সুখের কাল তাদের বনবাস। মাত্র ঐ কয়েকটা বছরই তাঁরা পরস্পরকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলেন। ইক্ষ্বাকু বংশের প্রথা অনুযায়ী জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে পিতৃরাজ্য রামেরই প্রাপ্য, সেই রাজ্য না-পেয়ে তিনি গৌরবহীন হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সুখহীন হননি। সীতা বন ভালবাসতেন। অরণ্যবাস তাঁর নিয়তিতে ছিল। কৈকেয়ী দুর্দৈব কাণ্ডটি ঘটাবার আগেই সীতা অনেকবার রামকে অনুরোধ করেছিলেন, চল আমরা বনে গিয়ে থাকি। এবং বনে থাকার সময় সীতা বারবার পরম সুখের কথা বলেছেন। কিন্তু সেখানেও তাঁদের সুখসম্ভোগের জীবনে অকস্মাৎ ছেদ পড়ে, রাবণ নামে একজন ব্যাধ সীতাকে তার দয়িতের কাছে থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক সেই দৃশ্যই প্রত্যক্ষ করলেন বাল্মীকি, নিষাদের হাতে কামমোহিত ক্রৌঞ্চের হননে এবং ক্রৌঞ্চীর কান্নায়। তিনি অভিশাপ দিলেন, মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং। এই অভিশাপ কি নিষাদকে না রাবণকে! ক্রৌঞ্চ-হত্যাকারী এই নিষাদ সত্যিই কখনও প্রতিষ্ঠাহীন হয়েছিল কিনা আমরা জানি না, তার কথা আর দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেন নি আদিকবি, কিন্তু আমরা জানি, রাবণ নামে ঐ মহানিষাদ শাশ্বতকালেও প্রতিষ্ঠা পায়নি।

অভিশাপটি উচ্চারণ করে বাল্মীকি নিজেই বিহ্বল হলেন। শোকে অভিভূত হয়ে এ তিনি কী করলেন, এ তো তাঁর মুখের ভাষা নয়! তিনি সেই দুটি ছত্রই বারবার উচ্চারণ করে দেখতে লাগলেন। তিনি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান; তিনি শুনে দেখলেন, এই বাক্য চরণবদ্ধ এবং অক্ষরবৈষম্য নেই, এমন-কি এমন একটি সুর এসে গেছে যা তন্ত্রীবাঁধা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে লয় মিলিয়ে গান করা যায়।

শিষ্য ভরদ্বাজ পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। বাল্মীকি তাঁকে বললেন, পাদবদ্ধ অক্ষরসম তন্ত্রীলয় সমন্বিত এই যে-জিনিসটা আমি সৃষ্টি করলাম, এটা কী? আমার শোকার্ত হৃদয় থেকে যখন এর জন্ম, তখন এর নাম হোক শ্লোক। ভরদ্বাজও এর রস উপলব্ধি করেছেন, তিনি সমর্থন করলেন গুরুকে। অবশ্য এখানেও প্রতিষ্ঠার কথা আছে। রাজশেখর আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে শ্লোক শব্দের আর-এক অর্থ কীর্তি। শিষ্যকে গুরু বললেন যে, শোকার্ত হৃদয় থেকে এর জন্ম হয়েছে বলে এর নাম হোক শ্লোক এবং এই শ্লোক আমার যশস্কর হোক। প্রকৃত কবির মতোই, বাল্মীকি প্রথম কবিতা রচনা করেই যশের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এবং পরে আমরা দেখেছি, রামায়ণ সম্পূর্ণ রচনা করেই তিনি এর প্রচারের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। চব্বিশ হাজার শ্লোক রচনা করে তিনি এমনি-এমনি ফেলে রাখতে চাননি।

যাই হোক, সেই পরম দিনটিতে আমরা ফিরে আসি, প্রথম শ্লোকটি রচনা করেই তিনি যে-কোন নবীন কবির মত উত্তেজনায় ছটফট করছেন। স্নান করতে-করতে, স্নান সেরে নিজের আশ্রমে ফিরে এসেও, তিনি অনুধাবন করে চলেছেন সেই শ্লোকের কথা। তাঁর সর্বাঙ্গে বিস্ময়। এমন-কি, একটু পরে, স্বয়ং ব্রহ্মা যখন হঠাৎ সেই আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন, তখনও বাল্মীকি তাঁকে পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা এবং স্তুতিবাদে অর্চনা করলেও মনে-মনে কিন্তু সেই নিষাদ আর ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর কথাই ভেবে চলেছেন। এবং মনে-মনে উচ্চারণ করে যাচ্ছেন তাঁর সদ্যরচিত শ্লোক।

ব্রহ্মার আগমন এখানে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক, তিনি এসেছেন বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার হুকুম দিতে। কিন্তু আমরা আগেই জেনে গেছি, বাল্মীকি কিছুএকটা সৃষ্টিতে উদ্যত, তিনি সন্ধান পেয়েছেন কাব্য-ভাষার। জীবস্রষ্টা ব্রহ্মাকে প্রজাপতি বলা হয়, কিন্তু এই অসার খলু সংসারে কবিরাও স্রষ্টা, তাঁরাও প্রজাপতি। এবং ব্রহ্মার সৃষ্টি ও কবির সৃষ্টি তুল্যমূল্য।

অন্তর্যামী ভূতভাবন ব্রহ্মা বাল্মীকির মনের কথা টের পেয়ে বললেন, তুমি যে সমাক্ষর বাক্যবন্ধ রচনা করেছ আমার অভিপ্রায়েই তা তোমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে। এ-কথা আমাদের ঠিক পছন্দ হয় না, এ যেন দেবত্বের সুযোগ নিয়ে বাল্মীকির কৃতিত্ব নস্যাৎ করা।

অবশ্য এই সঙ্গেই বলে দিলেন, তুমি যখন এর নাম দিয়েছ শ্লোক, তখন সে-নামই থাকবে। সে-নামই বিখ্যাত হবে। ব্রহ্মাও এখানে বাল্মীকিকে বর ও প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ব্যবহার করেছেন তিনি। তিনি বাল্মীকিকে আশ্বাস দিয়েছেন, যতদিন লোক পৃথ্বী কীর্তি থাকবে, এর জন্য তোমার কীর্তি-গতির ঊর্ধ্ব ও অধোলোকে [illegible] দিলেন, এই যে-কাব্যটি তুমি লিখতে যাচ্ছ, স্থায়ী হবে।

অনেক কথার মধ্যে ব্রহ্মা দুটি দরকারী কথা বলেছেন। নারদের মুখ থেকে শোনা কাহিনীর বাইরেও একটা অনুমতি দিলেন, নারদ যা বলেননি তা-ও তুমি লিখতে পারবে। স্বাধীনতা পেলেন বাল্মীকি। কিন্তু একটা সত্যও তোমার স্ফূর্তি পাবে। অর্থাৎ, আমাদের প্রথম কাব্য রচনার স্বাধীনতা পায়। কল্পনাবলে তা-ও তোমার স্ফূর্তি পাবে। জানিয়ে দেওয়া হল কবির পক্ষে প্রতি পদে বাস্তবের অনুসরণ করার দরকার নেই। নারদ বিবৃত করেছেন ইতিহাস, একজন রাজার জীবনে যা-যা ঘটেছে, তার বাস্তব বিবরণ। সেই বিবরণ কাব্য হয়নি। বাল্মীকি সে-রামকে চোখে দেখেননি, যার জীবনের শুধু কোটি-কোটি ঘটনাগুলি যার তিনি জানেন, সেই রামের সমস্ত জীবনকে কাব্যে রূপান্তরিত করতে হলে চাই কবির কল্পনাজগতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি যা সৃষ্টি করবেন তার নাম রস, এ-কথা ব্রহ্মাও বুঝেছিলেন, যাঁর সৃষ্টি শুধু কাঠ পাথর আর রক্ত মাংস দিয়ে।

ব্রহ্মার পরের কথাটিও মূল্যবান। নারদ যা বলেননি, কল্পনায় বাল্মীকি যা নির্মাণ করবেন, তা-ও মিথ্যে হবে না। নারদ বলে গেছেন সত্য ঘটনা, আর বাল্মীকির রচনাও হবে সত্য। এর নাম কাব্যের সত্য যা বাস্তব সত্য থেকে কিছুমাত্র কম নয়। এরই সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, রামের জন্মস্থান অযোধ্যা এ যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য বাল্মীকির মনোভূমি। সেই সত্য যা রচিবে তুমি।

ব্রহ্মা চলে যাবার পর বাল্মীকি নির্জনে বসে চিন্তা করতে লাগলেন। নারদ যে-কাহিনী বলে গেছেন তার সবটা মনে নেই, "পুনরায় সেই ধীমান্ রামের ইতিবৃত্ত প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হতে" ইচ্ছা করলেন, কিন্তু নারদকে তখন পাবেন কোথায়? তা ছাড়া তিনি প্রকৃতরূপে জানতে চান। কী সেই প্রকৃত রূপ? দৃশ্য সকলেই দেখে, ঘটনা যুগে-যুগে ছড়ায়, কিন্তু প্রকৃতরূপে জানা না-হলে সৃষ্টি করা যাবে না। বাল্মীকির মনের মধ্যে তখন দারুণ তোলপাড় হচ্ছে। কিন্তু এমন চঞ্চল দশায় কল্পনার বিকাশ হয় না। তাঁর মনস্থির করা দরকার, মনের মধ্যে চোখ খোলা দরকার। তিনি কুশের আসন পেতে পূর্ব দিকে মুখ করে আচমন সেরে নিয়ে চোখ বুজে বসলেন। মনশ্চক্ষে তিনি দেখতে লাগলেন রামকে। নারদ বলেছিলেন, "রাম গাম্ভীর্যে সমুদ্রের ন্যায়, ক্ষমতায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালানলের ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায়"—যেন এক পাথরের গড়া অতিমানব, এবং সীতার বর্ণনা দিয়েও নারদ অতি কৃপণ। কিন্তু বাল্মীকি দেখতে লাগলেন অন্য দৃশ্য, "উঁহাদের হাস্য-পরিহাস, কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপ এই সমস্ত যেন তাঁর প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান্ হতে লাগল।" সেই ধ্যানে বসেই তিনি করতলস্থিত আমলকির মতন দেখতে পেলেন সম্পূর্ণ রামায়ণ। তারপর লিখতে বসলেন।

নারদের প্রথম বাক্য ছিল : "রাম নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন।" আর বাল্মীকি শুরু করলেন, "প্রজাপতি মনু অবধি জয়শীল যে সমস্ত নৃপতি এই সসাগরা বসুমতীকে অনন্যসাধারণরূপে পালন করে এসেছেন", অর্থাৎ প্রথম বাক্য থেকেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর কল্পনার বিস্তার বিশাল।

এই আমাদের প্রথম কবিতা রচনার ইতিহাস।

সমস্ত কবিতা রচনার ইতিহাস এখনও পর্যন্ত, খানিকটা ছোটো আকারে এই রকমই।

সূত্র : রাজশেখর বসুর রামায়ণের সারানুবাদ এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুবাদিত বাল্মীকি রামায়ণ।

কবিতার সুখ দুঃখ

সাহিত্যের সবগুলি শাখার মধ্যে অনেকাংশে নিরস হচ্ছে কবিতাবিষয়ক রচনাগুলি। কবিতা যে-হেতু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অতীত, সেইজন্যই এই দুর্বোধ্য প্রবন্ধ রচনার প্রয়াসে এগুলি ও বস্তুটি, দুর্জ্ঞেয় ও গোলমেলে শব্দে কণ্টকিত। অধিকাংশ রচনাই যুক্তির আড়ালে, অথবা একটি [illegible] রচনার প্রতি আমার কোন মোহ নেই, পড়েছিও খুব কম, কী করে এ-রকম লিখতে হয় জানি না।

নিজের কবিতা নিয়ে কিছু লেখা এক বিড়ম্বনা মাত্র। তাতে অবধারিতভাবে স্বীকার করা হয় যে, আমার কবিতার বিশেষ কিছু মূল্য আছে। আমি নিজে বিশ্বাস করি, এতদিন শুধু কবিতা রচনার চর্চা করেছি মাত্র, আসল কবিতা এখনও লেখা হয়নি। এক অসম্ভব অতৃপ্তি ও যাতনা—যা অন্য কারুর পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব—আমাকে একটি নতুন কবিতা লিখতে বাধ্য করে। সেটি শেষ করার পরেই সেই অতৃপ্তি ও যাতনা আবার শুরু হয়। চিরকালের অতীত অভ্যাসের মতন এরা আমার সারা জীবনের সঙ্গী থাকবে। তাছাড়া কবিতা রচনার গূঢ় ইতিহাস কবি জানে না। অন্তত আমি জানি না।

এই পর্যন্ত লিখেই আমার এ-রচনাটি শেষ করা উচিত ছিল। বর্তমান প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট বিষয়ে আমার যা কিছু বলার ছিল বলা হয়ে গেছে। এরপর কয়েকটি পৃষ্ঠায় আমি যা লিখব, তাকে বলতে আমার আত্মজীবনী। যাঁর আগ্রহ আছে, তিনিই শুধু পড়বেন, এ-কথা বিনীতভাবে আগেই জানিয়ে রাখি। এর থেকে আর বেশি কিছু আশা বা আশঙ্কা করার দরকার নেই।

আমি প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করি একটি মেয়েকে উদ্দেশ করে, আমার বয়েস তখন পনেরোর একটু কম। কিন্তু কথা হচ্ছে এই, হঠাৎ আমি কবিতা লিখতে শুরু করলাম কেন? আমাদের বংশে বা পরিবারে কেউ কখনও লেখক ছিলেন না। সাহিত্যানুকূল আবহাওয়া ছিল না আমাদের বাড়িতে। আমার ধারণা থাকা স্বাভাবিক ছিল যে, কবিতা রচনা অন্য একধরনের মনুষ্যজাতির কাজ—কারণ আমার চেনাশোনা আত্মীয়স্বজন, বাবা-কাকা-আত্মীয়রা আহার-বাসস্থান সংগ্রহেই ব্যতিব্যস্ত। তবে আমার মধ্যে এই দুর্বলতা হঠাৎ জেগে উঠল কীভাবে?

প্রথম প্রণয়ের উন্মাদনা এর কারণ হতে পারে না। ঐ-বয়েসের ছেলে সমবয়েসী বালিকার প্রতি অহরহই আসক্ত হচ্ছে, কিন্তু সবাই তো কবিতা রচনা করে না। বিশেষত কবিতা রচনা কোন প্রণয়িনীকে কাছে পাবার মোটেই প্রকৃষ্টতম উপায় নয়। এবং আমি সেই বালিকাকে আমার সেই সদ্য-রচিত পদ্য পাঠাতেও সংকোচ বোধ করেছি। সুতরাং সম্পূর্ণ কারণবিহীন উপযোগিতাবিহীন—আমার সেই প্রথম কাব্যস্ফুরণ। এর কোনোই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই।

বরং একটি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কিঞ্চিৎ যোগাযোগ আছে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর এবং রেজাল্ট বেরুবার আগে যে তিন-চার মাসের ব্যবধান ছাত্রদের পক্ষে অবিমিশ্র ছুটির কাল—আমার বাবার মতে সেইটাই ছিল ছেলেদের বখে যাবার আদর্শ সময়। তিনি স্কুল-শিক্ষক ছিলেন, তিনি জানতেন। পরীক্ষার আগে আমরা ঐ-ছুটি কাটাবার কতরকম পরিকল্পনা

করি, সত্যি-সত্যিই ছুটি এলে তখন আর সময় কাটে না। অলস মস্তিষ্ক নিয়ে আমি প্রথমে পতিত হয়ে গেলাম। বাড়ির কড়া শাসনে, দুপুরবেলা আমার বেরুনো নিষিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ বাবা বাড়িতে থাকলে আমিও বাড়িতে। বাবা বাইরে বেরুলে মা-কে ভুলিয়ে-ভীলিয়ে আমিও বাইরে। কঠিন নিষেধের দুপুরগুলিতে আমি যাতে সম্পূর্ণ অলস না থাকি (আমার বাবা আমার গল্পের বই পড়ারও বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, 'নভেল নাটক' পড়া চরিত্র হানিকর)—আমার বাবা আমাকে ইংরেজি অধ্যয়নে নিয়োজিত করেছিলেন। ছুটির সময়টাতে আমাকে ভাল করে ইংরেজি শিখতে হবে। (পিতৃ-আজ্ঞা পালন না-করার জন্য এখন একটু একটু অনুতাপ হয়।) বাবা আমাকে টেনিসনের একটি কাব্যসংগ্রহ দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রতিদিন দুটি কবিতার অনুবাদ করতে হবে। এর মধ্যে কিন্তু কাব্যচর্চার কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রথমে আমাকে দিয়েছিলেন কার্লাইলের একটি প্রবন্ধপুস্তক—কিন্তু সেটি আমার এমনই শক্ত লেগেছিল যে অবিলম্বে আমি সে-বইটি হারিয়ে ফেলতে সক্ষম হই। তখন হাতের কাছে পাওয়া গিয়েছিল টেনিসনের ঐ-কাব্যসমগ্র।

টেনিসনের রচনা পাঠ করে আমি কাব্য সম্পর্কে মোটেই উদ্বুদ্ধ হইনি। গ্রীষ্মের দুপুরে বন্দী কিশোর বরং অভিশাপ দিয়েছে ঐ-কবিকে। আমার বাবা আমার প্রতি একটু অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন, তিনি কবিতার সাইজ বিষয়ে কোন নির্দেশ দেননি, যে-কোন দুটি কবিতা অনুবাদ করলেই হল। ঈশ্বরের অশেষ করুণা, তিনি টেনিসনকে কিছু ছোটো কবিতা লেখারও সুমতি দিয়েছিলেন।

বিকেলে বাবা দেখতেন আমার হোম টাস্ক। প্রথম-প্রথম অনুবাদ আক্ষরিক কিনা মিলিয়ে দেখতেন। পরে কবিতাকার দুটি রচনা দেখাতে পারলেই হত। বাবা নিমেষমাত্র চোখ বুলিয়ে লাল পেন্সিলে সে দুটি কেটে দিতেন, পরদিন আবার নতুন দুটি। আমাকে দুপুরে বাড়িতে আটকে রাখার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। বাবা আমার অনুবাদ আর মিলিয়ে দেখছেন না—এটা জানতে পেরেই আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগে। অনুবাদ করার পরিশ্রম বাঁচিয়ে নিজে কিছু এলেবেলে লিখলেই তো হয়। পরদিন টেনিসনের দুটি কবিতার অনুবাদ নামে আমি যে দু-পাতা রচনা পেশ করেছিলাম, সে দুটি আসলে আমার তৎকালীন হৃদয়েশ্বরীকে উদ্দেশ করে লেখা দুটি সাঙ্কেতিক চিঠি—লাইন ভেঙে কবিতার মতন সাজানো। বেশ কয়েকদিন এ-রকমই চলেছিল, তার মধ্যে দু-একটি ছন্দ মিলিয়ে কবিতার মতনই লেখা হয়ে গেল। তখন আমার এতই সুযোগ যে টেনিসনের নামে রবীন্দ্রনাথের কবিতা টুকে দিলেও বাবা লক্ষ্য করতেন না—তবু নিজে থেকে ছন্দ মিলিয়ে লিখতে গেলাম কেন, কে জানে! টেনিসনের কাব্য-অনুবাদের সঙ্গে আমার কাব্যরচনা শুরুর কোন কার্যকারণ যোগাযোগ খুঁজে বার করা দুষ্কর। আমার পিতা চেয়েছিলেন আক্ষরিক অনুবাদ, ছন্দ-মিল আনয়ন আমার নিজস্ব উৎসাহ-প্রসূত, এবং ব্যক্তিগত চিঠিতে ছন্দ মিলের প্রয়োগের কারণ আরও দুর্বোধ্য। সঙ্গীহারা বিহঙ্গের শোকে আর্দ্র বাল্মীকি ছন্দ উচ্চারণ করেছিলেন—আমি ছন্দকে পাই এক বালিকাকে সঙ্গিনী হিসেবে পাবার আকাঙ্ক্ষায়। (পাইনি।)

সেই একটি রচনা ঝোঁকের মাথায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম 'দেশ' পত্রিকায়। কবি-খ্যাতির আশায় নয়, শুনেছিলাম কোন লেখা ছাপা হলে সেই পত্রিকা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, সত্যিই ডাকযোগে একদিন 'দেশ' পত্রিকার একটি প্যাকেট পেলাম। আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৫০ সালের কোন এক মাসের 'দেশ' পত্রিকায়, কবিতার নাম "একটি চিঠি"। বন্ধুবান্ধব এবং সেই কিশোরী আমায় বলেছিল, দেখেছ, 'দেশ'-এ একজন একটা কবিতা লিখেছে। ঠিক তোমার সঙ্গে নাম মিলে গেছে। আমিই যে ওটা লিখতে পারি তা কেউ কল্পনাও করেনি, আমিও বলিনি। এবং আমার নামটি এমনই এলেবেলে যে অনেকের সঙ্গেই মিলে যাওয়া সম্ভব। পরবর্তীকালে আমার অন্য এক ভালবাসার রমণীর গৃহভৃত্যের নামও ছিল সুনীল।

আমার সেই কবিতায় ছন্দ এবং মিল নিশ্চিত নির্ভুল ছিল। তৎকালীন 'দেশ' পত্রিকায় কবিতা ছাপার এটাই ছিল প্রাথমিক বিচার। কিন্তু প্রথম রচনাতেই ছন্দ এবং মিল আমার আয়ত্ত হল কী করে? এরও কোন উত্তর আমি দিতে পারব না। আমি আগে কখনও কবিতার চর্চাও করিনি—কবি-খ্যাতি অর্জনের বিন্দুমাত্র বাসনা আমার হৃদয়ে জাগেনি। ছন্দ-অলঙ্কারের কোন বই আমি তখনও পড়িনি, আজও পড়িনি। একমাত্র আমার সম্বল ছিল ভাষাজ্ঞান। পরীক্ষায় কম নম্বর পেলেও সমবয়সী কিশোর-কিশোরীদের চেয়ে আমার বাংলা জ্ঞান বেশি, এ-সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। অহংকারের কথা নয়, সত্যি কথা। অন্য অনেকের তুলনায় আমি বাংলা বই পড়েছি অনেক বেশি, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ থেকে শুরু করে পাঁচকড়ি-দীনেন্দ্রকুমার-হেমেন্দ্রকুমার তো বটেই—এ ছাড়াও যাবতীয় পাঠ্য, অপাঠ্য, নিষিদ্ধ বাংলা বই কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা ও গান আমার মুখস্থ ছিল, এবং তাঁর প্রভাবেই সম্ভবত, কবিতার লাইনে ছন্দপতন হলে আমার কানে লাগত। আমার ছন্দ জ্ঞান সম্পূর্ণত কান-নির্ভর। প্রথম থেকেই নির্ভুল ছন্দ সম্পর্কে সজাগ ছিলাম বলেই অচিরকালের মধ্যেই আমার ছন্দ-ভাঙতে দারুণ ইচ্ছে জাগে। যুবা বয়েসে বিপ্লবীরা যেমন অক্লেশে মানুষ খুন করে, আমিও সেই বয়েসে অম্লানবদনে ছন্দ ও রীতিনীতি তছনছ করে ভেঙে দারুণ আনন্দ পেতাম। আমার বিপ্লব ঐ-ভাঙনের নেশায় মেতেছিল।

কলেজে সদ্য ভর্তি হয়ে আমি খাতার পর খাতা কবিতা লিখে ভরিয়ে দিয়েছিলাম। সেগুলি ছাপার জন্য কোথাও পাঠাইনি—মনে হত এগুলি আমার একান্ত নিজস্ব, লোকচক্ষুর গোচরে এলেই এদের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মধ্যরাত্রে খাতা খুলে দু-তিন লাইন লিখে অনিশ্চিত যন্ত্রণা নিয়ে বসে থাকার মধ্যে যে অসহ্য আনন্দ—আমি তার স্বাদ পেয়ে গেছি। কী হয় এগুলো লিখে, কেন আমি লিখি—এ-প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবার কোন সাধ্য ছিল না আমার। সেই মেয়েটির প্রতি প্রণয় যতই প্রগাঢ় হচ্ছিল, ততই আমি তার থেকে দূরে সরে যেতে চাইছিলাম—অস্থির ছটফটানি নিয়ে আমি প্রায়ই কলেজ ছেড়ে চলে যেতাম। সামান্য দু-পাঁচ টাকা সম্বল করে ঘুরে বেড়াতাম ভারতের নানা প্রান্তে, অখ্যাত-নগণ্য বহু জায়গায়—এবং যেন নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই লিখতাম কবিতা। বস্তুত সেই সময় কবিতা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। আমার সেই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের কাব্যরাশির কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই, তিনটি খাতাই চুরি হয়ে যায়—অন্যান্য বইপত্রের সঙ্গে। কেউ আমার কাব্যকীর্তি অপহরণ করার উদ্দেশ্যে সেগুলো অবশ্যই নেয়নি, নিশ্চিত সে সব খাতার পৃষ্ঠাগুলি অচিরেই ঝাল-মুড়ির ঠোঙা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছে।

আমার সৌভাগ্য এই, আমার প্রথম বয়েস থেকেই আমি কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর পাল্লায় পড়িনি। আমি পূর্ববঙ্গের গণ্ডগ্রাম থেকে আগত কিশোর, কলকাতার ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম। কোন লেখককে চোখে দেখিনি, কোন সম্পাদককে চিনতাম না, স্বয়ং লেখক হবার কোন দুরাকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না—আমার স্বপ্ন তখন জাহাজের খালাসি হয়ে সাত-সমুদ্র পাড়ি দেওয়া। আমার কাব্যকর্মতার জন্য একটি মাত্র উপকার তখন পেতাম। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে বাংলা রচনায় প্রচুর পরিমাণে কোটেশন ছড়িয়ে দেওয়াই নিয়ম। আমি কলেজীয় প্রবন্ধের স্থানে-অস্থানে 'তাই তো কবি বলিয়াছেন' বলে তৎক্ষণিক স্বরচিত পাঁচ-ছ লাইন কবিতা রবীন্দ্রনাথ নজরুল প্রভৃতির নামে চালিয়ে দিয়েছি বহুবার, আমার অধ্যাপকরা কোনদিন সে-সব ধরতে পারেননি।

আমার বাল্যবন্ধুদের মধ্যে দীপক মজুমদার (এখন সে গ্রীসে স্বেচ্ছা নির্বাসিত) অল্প বয়েস থেকেই কবি হিসেবে বেশ পরিচিত—নানা পত্রপত্রিকায় তার লেখা ছাপা হয়, বিমলচন্দ্র ঘোষ

ও গোপাল হালদারকে সে যথাক্রমে বিমলদা ও গোপালদা বলে উল্লেখ করে, জীবনানন্দ দাশকে সে অবক্ষয়ের কবি বলে ভর্ৎসনা জানায়—এবং সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার আগেই সে দু-দু-বার অকিঞ্চিৎকর কারণে জেল খাটার কৃতিত্ব অর্জন করেছে—বন্ধুবান্ধবদের কাছে তার খুব অহংকার। আমি মাঝে-মাঝে ঈর্ষান্বিত বোধ করতুম। তখনও পুলিসের হাতে ধরা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। (পরে বহুবার হয়েছে, বলাই বাহুল্য!) কিন্তু কবিতা বিষয়ে আমি হার স্বীকার করব কেন? কবিতা রচনা তো আমার কাছে ছেলেখেলার মতন সহজ এবং সেগুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করাও এমন-কিছু কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। তখন আমি ছাপার জন্য কবিতা ডাকযোগে পাঠাতে লাগলুম—'পরিচয়', 'অগ্রণী', 'শতভিষা', 'পূর্বাশা', 'সাহিত্যপত্র' এবং 'কবিতা' পত্রিকায় : ছাপার অক্ষরে আমার চতুর্থ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়—কিছুকাল পরে সেই কবিতাটিই আবু সয়ীদ আইয়ুব-সম্পাদিত 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' সংকলনে গৃহীত হয়েছিল একেবারে শেষ পৃষ্ঠায়, এবং সেই সুবাদে আমি কিছুদিনের জন্য তৎকালীন তরুণতম কবি হিসেবে গণ্য হয়েছিলাম।

থার্ড ইয়ারে উঠে আরও কয়েকজন নবীন কবির সংস্পর্শে এসে আমি প্রকাশ করেছিলাম 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা। আমি ও দীপক মজুমদার ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজের কায়দায় যুগ্মভাবে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েছিলাম সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্তর কাছে। দিলীপকুমার গুপ্ত অর্থাৎ ডি. কে এই দুই অর্বাচীনের স্পর্ধা দেখে হেসে ওঠেননি কিংবা এককথায় বিদায় করে দেননি—বরং মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আমাদের তখুনি কবিতার বই প্রকাশের ব্যাপারে নিবৃত্ত করেছিলেন এবং একটি কবিতার পত্রিকা প্রকাশের পরামর্শ দিয়েছিলেন। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা বাংলা কবিতায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পেরেছিল আশা করি। ঐ-পত্রিকা বিষয়ে আর বিশেষ কিছু না-বলে শুধু একটি কথা উল্লেখ করি, ঐ-পত্রিকার জন্যই আমি আমার বাল্য প্রণয়িনীকে হারাই। পত্রিকা সম্পাদনা এবং নিজস্ব কবিতা রচনায় কয়েক বছর আমি এমনই মেতে উঠেছিলাম যে, সেই রমণী কিংবা কোন রমণীর দিকেই মনোযোগ দেবার সময় ছিল না। এখানে একটি প্রশ্ন আসে। একটি মেয়ের জন্যই যার কবিতা রচনার শুরু, সে কেন কবিতা রচনার উন্মত্ততায় সেই মেয়েটিকেই পরিত্যাগ করে? কবিতা কি নারীর চেয়েও বেশি কিছু দিতে পারে? এবং এ-কথাও ঠিক, বহু পুরুষ ও রমণী পরস্পরকে নিবিড়ভাবে পায় কিন্তু তারা কবিতার তোয়াক্কা করে না। তবে কেন একদল অভিশপ্ত প্রাণী, যাদের কবি বলা হয়, এইসব টুকরো রচনার জন্য নিজেদের বহুভাবে বঞ্চিত করে? কবিতার জন্য অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার করতে হয়, এ-কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। কবিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুতও করে নিতে হয়—বড় কঠোর সেই প্রস্তুতিপর্ব।

কবিতা লিখতে আমার কষ্ট হয়। আমি ইদানীং গল্প-উপন্যাসও রচনা করে থাকি, কিন্তু ও-সবের তুলনায় কবিতা রচনার কষ্ট অনেক বেশি। এই শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করা যে কি সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক ব্যাপার—ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যে তা বুঝবে না। যেন একটু অসতর্ক হলেই আঙুল ঝলসে যাবে কিংবা তুষারক্ষত হবে। শব্দের এই খেলার সময় সমস্ত স্নায়ু এমন উদগ্র ও টনটনে হয়ে থাকে যে তার ফলে শারীরিক যন্ত্রণা হতে পারে। কবিমাত্রই যে-কারণে কিছু-না-কিছুভাবে অসুস্থ। অর্জুন যেমন তীর নিক্ষেপের আগে শুধু পাখির চোখের দিকে সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন, প্রত্যেক কবিকেই শব্দের ব্যবহারের সময় সেইরকমভাবে পাখির চোখের দিকে তাকাতে হয়। এই একাগ্রতার মূল্য দিতে হবে না? তার চোখ জ্বলে যায়—অতৃপ্তি ও অসুখ তাকে সারাজীবন তাড়া করে। সে সমাজ থেকে নির্বাসিত—এই বোধ তার মনপ্রাণ জুড়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের মতন অসুখী মানুষ আর কে? সারাজীবন শান্তি খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

কেন কবিরা এই দুঃখের জীবন বরণ করে নেয়? খ্যাতি কিংবা অমরত্বের লোভে? খ্যাতি যখন আসতে শুরু করে, তখন তার প্রতি মোহ জন্মান সম্ভব, খ্যাতির প্রতিযোগিতাতেও কেউ-কেউ মাতে। কিন্তু অখ্যাত অবস্থায়, প্রথম যৌবনে কোন কবিই আত্মক্ষয় করে খ্যাতি পাবার লোভে কবিতা রচনা করে না। ওটা ভুল ধারণা। অন্তত আমার সে-রকম কোন কারণ ছিল না, আমি আগেই বলেছি। আর অমরত্ব? অমরত্ব কথাটার সঠিক মানে হচ্ছে মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রেখে এই জীবনটা পুরোপুরি উপভোগ করা। মৃত্যুর পর পোকায়-খাওয়া হলদে বইয়ে নাম রেখে যাওয়ার জন্য এ জীবনটা নষ্ট করে কে? কিন্তু আর যে-ই করুক, কোন কবি কখনও জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। এইসব শব্দের স্থপতিরা অক্লান্তভাবে পৃথিবীকে শব্দ-রূপের প্রতিরূপ নির্মাণ করে যাচ্ছে। যদিও এই ভার তাদের কেউ দেয়নি, পৃথিবীরও বোধহয় কিছু যায় আসে না। দিবাবসানে সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়েও সে দেখে না সমুদ্রের রূপ, সে তখন মনে-মনে আর-একটি সমুদ্র গড়ে তোলায় ব্যস্ত। জীবন তার কাছে রূপক জীবন, বাস্তব নয়। সে রৌদ্রঝলকে দেখতে পায় বর্শার ফলক, বৃষ্টির ফোঁটায় যুঁই ফুল। ভাল করে ভেবে দেখতে গেলে বিকারগ্রস্ত কিংবা উন্মাদের সঙ্গে তার ব্যবধান অতি সামান্যই, তাকে অনায়াসে ভূতগ্রস্ত বলা যায়। এটা স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যই আমি একসময় লিখেছিলাম, 'শুধু কবিতার জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি'।

ভালবাসারই মতন, কবিতা নেয় অনেক বেশি, দেয় খুব কম। শুষে নেয় জীবনীশক্তি, ফিরিয়ে দেয় শুধু এক সম্ভাবনার ঝলক।

আমার মনে আছে, ডেহরি-অন-শোন স্টেশনে এক শেষরাত্রে বসেছিলাম। অসহ্য শীত। কানেকটিং ট্রেনে ডালটনগঞ্জ থেকে এসেও মেল ট্রেন ধরতে পারিনি। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না। তীক্ষ্ণ শীতের হাওয়া বিছুটির মতন শরীরে লাগছে। কোন ওয়েটিং রুমেই তিলধারণের জায়গা নেই। শীত কাটাবার জন্য লম্বা প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিলাম। পেটে অসম্ভব খিদে। খিদের জন্য শীত বেশি লাগে। অত রাত্রে খাবার পাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না—কাপের পর কাপ বারবার ফোটান বিস্বাদ চা খেয়ে যাচ্ছি। একা ছিলাম, কথা বলার কেউ নেই। সহিষ্ণু স্বভাবের হলেও সে-দিন সত্যিই আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম খুব। সেই অবস্থায় হঠাৎ আমার মাথায় একটা লাইন এল,'ভ্রূপল্লবে ডাক দিলে, দেখা হবে চন্দনের বনে।' বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন আমি চমকে উঠলাম। এই লাইনটা কোথায় ছিল? কেন এই শীতের শেষরাত্রে আমার মাথায় এল। এর তো কোন অনুষঙ্গ নেই—কোন মিল নেই এই স্টেশনের দৃশ্যে। চন্দনের বনে দেখা হবার কথা কার সঙ্গে? পাঠক ভুল বুঝবেন না, আমি এই লাইনটির প্রশস্তি করছি না, কবিতা হিসেবে হয়ত এর কোনই মূল্য নেই—কিন্তু সেই রাত্রে আমার কাছে মূল্য ছিল। এই লাইনটি হয়ে গেল আমার গরম পোশাক, আমি শীত এবং কষ্ট বিস্মৃত হয়ে তখন এই লাইনটি নিয়ে উত্তেজিত হয়ে রইলুম এবং ততোধিক কষ্ট সহকারে ঘুমন্ত মানুষে ভর্তি একটা বেঞ্চিতে কোনোরকমে একটু জায়গা করে নিয়ে বসে পরবর্তী লাইনগুলি কাগজ-কলমে রচনা করতে লাগলুম। অবশ্য, প্রথম যৌবনেই এইরকম সব কাণ্ড ঘটে। বয়স বাড়তে থাকলে আস্তে-আস্তে এ-ধরনের পাগলামি কমে যায়। বেশি বয়সের কবিতার মধ্যে থাকে না সেই উষ্ণতা। তখন কবিতা গালভারি হয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে কবিতায় আবিষ্কারের প্রসঙ্গ এসে গেল। কবিতার মধ্যে এমন কিছু-কিছু ব্যাপার থাকে, যা পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়, সমালোচকরাও ধরতে পারেন না—কিন্তু কবির কাছে তার মূল্য অসীম। লিখতে-লিখতে কোন একটা জায়গায় এমন একটি শব্দ বা লাইন বা উপমা এসে যায়—সেটা তাঁর কল্পনাতেও কোনদিন ছিল না। সেই শব্দ বা উৎপ্রেক্ষার আকস্মিকতা, তার দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকবার মতন ভঙ্গি, কবিকে আপ্লুত করে দেয়। সেই মুহূর্তে সেই কবি নিউটন বা আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর মতন আবিষ্কারক এবং সুখী। প্রত্যেক

কবিরই এই অভিজ্ঞতা আছে, আমাকে আমার নিজের কবিতা বিষয়েই বলতে হবে, এজন্য
লজ্জিত। অসংখ্যের মধ্যে একটি উদাহরণ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। বারান্দার টবে একটি
গোলাপ ফুল ফুটেছিল। একটিই ফুল, তার বর্ণ ঠিক গোলাপি, সাদা বা লাল নয়। আমি
অন্যমনস্কভাবে গোলাপ ফুলটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। রিলকের গোলাপ-বিষয়ক ছোটো
কবিতাটি মনে পড়ছিল। আমি নিজে গোলাপ বিষয়ে কিছু লেখার কথা চিন্তাই করি না, এত
বেশি লেখা হয়েছে যে আর-কিছু লেখা প্রায় চাঁদ বিষয়ে লেখার মতনই হাস্যকর। অসংখ্য
উপমায় বেচারা গোলাপ জর্জরিত। তবু আমার বিরূপতা সত্ত্বেও একটা লাইন আমার মাথায়
এসে গেল। 'একটি গোলাপ ফুল গোলাপের মত ফুটে আছে।' নিভৃতে আমি চমকে উঠি এবং
স্বীকার করতে বাধা নেই, অসম্ভব খুশি। গোলাপ ফুলকে গোলাপ ফুলের সঙ্গেই তুলনা দেবার
কথা আমি তো আগে কখনও ভাবিনি। কে আমাকে এই কল্পনাটা উপহার দিল। তবু এই প্রথম
লাইনটিতে খানিকটা দুর্বলতা ছিল, 'মতো' শব্দটা আমাকে ব্যবহার করতে হয়েছে—এখানেও
উপমার চেষ্টা এড়াতে পারিনি। কবিতাটা লিখতে শুরু করে স্তবকের শেষ লাইনে লিখলাম
'পায়ের তলায় ভিজে ঘাস ঠিক পায়ের তলার ভিজে ঘাস'—এখানে আর 'মতো' নেই, উপমা
নেই—লাইনটা লিখতে আমি সত্যিই পায়ের তলায় ভিজে ঘাসের স্পর্শ পেয়েছিলাম।

কালিফোর্নিয়ার মরুভূমির নকল সোনার মতন এইধরনের কিছু-কিছু আবিষ্কারও অবশ্য
অকিঞ্চিৎকর। সেই মুহূর্তে কবিকে চমকে দেয়, পুলকিত করে—কিন্তু সময়ের বিচারে টেকে
না। অসংখ্যের মধ্যে একটি উদাহরণ : একবার আমার মনে হয়েছিল রাত্তিরবেলা সব স্বপ্ন
জানালার ঝিল্লিতে এসে থমকে থাকে—ঘুমন্ত মানুষের চোখের ওপর বসবে—তার জন্য
বিশেষ মুহূর্তটি খোঁজে। আইডিয়াটি আমাকে এমনই আকৃষ্ট করেছিল যে দু-তিনটি কবিতায়
আমি এর ব্যবহার করেছি। এখন অবশ্য বুঝতে পারি—ওটা এমন-কিছু একটা ব্যাপার নয়,
এলেবেলে কিংবা বাজেও বলা যায়। কবির প্রিয় লাইন বা কবির মুগ্ধ মুহূর্তের রচনামাত্রই
সার্থক কবিতা নয়।

কবিতা রচনা শেষ করার পর প্রত্যেক কবির মনেই একটা বিস্ময়বোধ জাগে বোধহয়।
অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে মনে হয়, এই যে এইমাত্র একটি জিনিস শেষ করলাম, এটা আগে
কোথায় ছিল? কোনদিন তা ভাবিনি, সেইরকম দৃশ্য বা শব্দবন্ধও হঠাৎ কী করে কলমের
ডগায় এসে যায়, সেই এক পরম রহস্য। আমার অধিকাংশ কবিতাই হঠাৎ এসে-যাওয়া—এক
মুহূর্তে আগেও যা চিন্তা করিনি, অকস্মাৎ সে-রকম কিছু লিখতে শুরু করি। এই প্রসঙ্গে আর-
একটা কথা এসে পড়ে। প্রথম যৌবনে আমি বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির সঙ্গী ছিলাম—কিন্তু
আমার কোন রচনা আমার তৎকালীন বন্ধুদের খুশি করতে পারেনি। আগে থেকে কোন আদর্শ
মাথায় রেখে কিছু লেখার ক্ষমতা আমার নেই। সমাজতন্ত্রে আমার বিশ্বাস থাকলেও সাহিত্যে
তার ব্যবহার জানি না। ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া আর কোন-কিছুই আমার সম্বল
নেই—সাহিত্যের কাছে আমি অসহায়।

কবিতা রচনা শুরু করার আট বছর বাদে বেরোয় আমার প্রথম কবিতার বই। তখনও বই
বিষয়ে আমার খুবই সঙ্কোচ ছিল। তবু সেটি ছাপা হয় আমার এক বন্ধু, সমীর রায়চৌধুরীর
আগ্রহে ও ভালবাসায়। তাও নিজের হাতে আমি কারুকে আমার বই দিতে যেতে লজ্জা
পেতাম। নিজের রচনা বিষয়ে দ্বিধা কিছুতেই কাটে না, আজও আমার কাটেনি। নানা
পত্রপত্রিকায় ছাপা হওয়াই তো সার্থকতার বিচার নয়। আমি যা-লিখছি, এগুলো যে আজে-
বাজে নয়, এ-কথা কে আমাকে বলে দেবে? প্রতি মুহূর্তে এই দ্বিধা মনের মধ্যে কাজ করে।
কেউ কেউ বলেন, আমার কবিতাগুলি নিছক নাটুকে, গদ্য-ঘেঁষা, স্রেফ অকবির রচনা।
তৎক্ষণাৎ সেইসব কথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। এ-কথাও তো ঠিক, আমার কবিতায়
কাহিনীর আভাস বা চরিত্র মাঝে-মাঝেই এসে যায়—খাঁটি কবিতায় এ-সব অবাঞ্ছনীয় কিনা

আমি সঠিক জানি না। আমার অধিকাংশ কবিতাই স্বীকারোক্তিমূলক—সেই জন্য বোধহয়
আমার এমন একটি কবিতাও নেই, যাতে 'আমি' শব্দটি অন্তত একবারও ব্যবহার করা হয়নি।

আগেই বলেছি, আমি বেশ-কিছু বছর পর্যন্ত খ্যাতিমান কবিদের চাক্ষুষভাবেও চিনতাম
না। 'কৃত্তিবাস' ছিল তরুণদের পত্রিকা, তাই প্রবীণদের কাছে লেখা চাইতেও যেতাম না।
অগ্রবর্তী কবিদের মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রথম আমাকে পাত্তা দিয়েছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে
আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, তোমার কবিতা পড়েছি। ক্রমশ আলাপ-পরিচয় হবার
পর তিনি আমার কবিতার এমন প্রশংসা আরম্ভ করে দিলেন যে, ঘাবড়ে গিয়ে আমি তাঁর
বাড়িতে যাওয়াই বন্ধ করে দেবার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। প্রশংসায় আনন্দ হয়, আবার
ভয়ও হয়। তবু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতার শব্দ ব্যবহার নিয়ে যে-সব আলোচনা করতেন
তখন, তাতে আমি নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার সুযোগ পেয়েছি। 'কবিতা' পত্রিকায় আমার
পাঠানো প্রথম কবিতাই ছাপা হয়েছিল; কিন্তু দ্বিতীয় কবিতা, "উনিশে বিধবা
মেয়ে"—বুদ্ধদেব বসু আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, কবিতাটি তাঁর পছন্দ হয়েছে,
কিন্তু কিছু-কিছু পরিবর্তন করা দরকার। আমি পরিবর্তন করে পাঠালুম। তিনি আবার ফেরত
পাঠিয়ে বদলাতে বললেন—আমি আবার পাঠালুম, পনেরো লাইনের কবিতা তিরিশ লাইন
হয়ে গেল। এইভাবে বুদ্ধদেব বসু দূর থেকে আমার শিক্ষকের কাজ করেছেন। এ ছাড়া
জীবনানন্দ দাশ আর বিষ্ণু দে ছিলেন আমার প্রিয় কবি—ওঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার
একমাত্র উপায় ছিল, ওঁদের কবিতা মুখস্থ করে ফেলা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা মুখস্থ
করে শিখেছিলাম কথ্য ভাষার মতন ছন্দের ব্যবহার।

বিরলে বসে যখনই নিজের কবিতা বিষয়ে ভাবি, তখন মনে হয় কিছুই লিখতে পারিনি।
যত লিখছি, যত চেষ্টা করছি, ততই বুঝতে পারছি শব্দের সেই পবিত্রতাকে স্পর্শ করা কত
দুরূহ। ছেলেমানুষী বয়েস কেটে গেলে বোঝা যায় কবিতা লেখাটা ছেলেখেলা নয়, তখনই
লিখতে গেলে ভয় করে। আবার এ-কথাও ঠিক, কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে নিজের দু-একটা
কবিতা পড়ে বেশ লাগে। কণ্ঠ নষ্ট হয়ে যাবার পর শ্যালিয়াপিন রেকর্ডে নিজের যৌবনের
সোনালি কণ্ঠস্বর শুনে যেমন কেঁদেছিলেন, তেমনই নিজের পূর্বেকার কবিতা পড়তে-পড়তে
গলায় বাষ্প জমে, মনে হয়, আমিও একদিন বেঁচে ছিলাম, আমারও কিছু মূল্য ছিল—যত
সামান্যই হোক।

বঙ্কিমচন্দ্র

একা কোথাও বেড়াতে গেলে, ট্রেনযাত্রার সময় সঙ্গে কোন বই না-থাকলে আমার কিছুতেই চলে না। সাধারণত প্ল্যাটফর্মের দোকান থেকেই দু-একটা বই কিনে নেওয়া আমার অভ্যেস। ইদানীং সেইভাবে বই কিনে বার-বার ঠকছিলাম। আজকাল বিদেশি পত্র-পত্রিকা খুব কম আসে, নতুন লেখকদের বইয়ের সমালোচনা পড়ে আগে থেকে কোন মতামত তৈরি করে নিতে পারি না। যেহেতু পুরনো এবং চেনা লেখকদের বই শেষ হয়ে গেছে তাই নতুন লেখকদের বই বাছতে হলে মলাটের চাকচিক্য এবং পেছনের পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করতে হয়। পর-পর সে-রকম কয়েকজনের বই কিনে দেখেছি প্রত্যেকটিই অখাদ্য।

কিছুদিন আগে বার্নপুর যেতে হয়েছিল একটা কাজে। ট্রেনে একা যেতে হবে। কী বই সঙ্গে নিই? কলকাতা ছাড়ার আগে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের হাতে একখণ্ড 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী' দেখে সেটাই কেড়ে নিলাম। এই খণ্ডটিতে বঙ্কিমের সব-ক'টি উপন্যাস রয়েছে। আমার বাড়িতে 'বঙ্কিম রচনাবলী'র যে একটি মাত্র খণ্ড আছে, তাতে রয়েছে শুধু কিছু প্রবন্ধ, 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'কৃষ্ণচরিত্র'। সেগুলি মাঝে-মাঝে পড়েছি বটে, কিন্তু সে-দিন প্রথম অনুভব করলাম বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি আমি বহুদিন চর্মচক্ষে দেখিনি। সুতরাং এই এক চমৎকার সুযোগ।

অনেকের ধারণা, ট্রেনযাত্রার সময় বুঝি লঘুপাঠ্য বই-ই সঙ্গে রাখতে হয়। আমার জীবনে সে-রকম কোন নিয়ম নেই। আমি ট্রেনে কবিতার বই, প্রবন্ধের বই, গোয়েন্দা কাহিনী—সমান আগ্রহ নিয়েই পড়ি। ওভিডের 'মেটামরফোসিস', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', স্টেইনবেকের 'ইস্ট অব ইডেন' ইত্যাদি বই আমি ট্রেনে বা বিমানে শেষ করেছি, মনে আছে।

দৈবাৎ বন্ধুর হাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ-খণ্ডটি পাওয়া একটি আকস্মিক ঘটনা। সে-দিন ঐ-বইটি হাতে না-পেলে হয়ত আরও বহুদিন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি আমার পড়াই হত না। শখ করে কে আর ঐ-সব পড়ে। কিন্তু এই কাকতালীয় যোগাযোগের ফলেই আমার জীবনে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। আমার মানসিক জগতে রীতিমতন একটা আলোড়ন এবং পরিবর্তন দেখা দিল বলা যায়। পাঠকদের কাছে আমি আমার সেই অভিজ্ঞতার কথা জানাতে চাই।

আমার পাঠক-জীবন মোটামুটি পঁচিশ বৎসরের। বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে তেমন কিছু না-জানলেও, বাংলা সাহিত্য আমার বেশ ভালই পড়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্র আমার অপরিচিত লেখক নন্। খুব ধারাবাহিকভাবে না-হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের বহু রচনাই আমি প্রথম যৌবনে একবার দু-বার পড়ে ফেলেছিলাম, প্রবন্ধগুলি পড়েছি অনেকবার, কিন্তু এবার আমি যেন বঙ্কিমচন্দ্রকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম।

আরও অনেকের মতন আমিও বাঙালি; সাহিত্যের কয়েকটি গুজবে বিশ্বাসী। গুজবগুলিকে হঠাৎ গুজব হিসেবে চিনতে পারলে নিজেকে কীরকম অসহায় মনে হয়, সেইরকমই বাংলায় সুদীর্ঘকালের গুজব এই যে ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিম এখনও মহত্তম। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যতই ভাল লিখে থাকুন, খাঁটি ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিম এখনও আদর্শস্বরূপ। এবং তিনি যুগস্রষ্টা ও ঋষি। তাহলে আমি এগুলো কী পড়লাম?

বার্নপুর যাত্রার পর থেকে আরও একমাসের মধ্যে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সব-কটি উপন্যাস পড়ে শেষ করেছি। শুরু করেছি একেবারে প্রথম উপন্যাস থেকে, তারপর পাতার পর পাতা নিঃশেষ করেছি অধীর আগ্রহে। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এত খারাপ? একি সত্যিই বিশ্বাস করা যায়?

এ জন্য দারুণ মনোকষ্ট পেয়েছি আমি। হায়, যৌবনের কত স্বপ্ন কত উচ্চ আদর্শ ছিল বঙ্কিমকে ঘিরে। সেগুলি সব ভুল? স্কুল-কলেজে, বিভিন্ন প্রবন্ধপুস্তকে আমাদের এইভাবে প্রতারণা করা হয়েছে? এই উপলব্ধি বড় মর্মান্তিক। এর চেয়ে, এই গ্রন্থটি আমার না-পড়াই ভাল ছিল। স্বপ্ন ভাঙার চেয়ে ভুল-স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা হয়ত মধুর!

ঋষি বঙ্কিম বা স্বদেশচেতনার উদ্গাতা হিসেবে বঙ্কিমের যে-চিত্র, তার প্রচার হতে শুরু হয়েছে তাঁর মৃত্যুর দশ-বারো বছর পর থেকে। এ-কথা বলেছেন তাঁর সমসাময়িক একাধিক ব্যক্তি, জীবিতকালে বঙ্কিম পরিচিত ছিলেন প্রধানত ঔপন্যাসিক এবং সুসম্পাদক হিসেবে; পরবর্তীকালে আমরা তাঁকে একমাত্র ঋষি বঙ্কিম বলেই সম্বোধন করতে শিখেছি, এবং তাঁর রচনার সব-কিছুতেই মহত্ত্ব আরোপ করেছি। উপন্যাসের বিচার যে তার শিল্পরূপের বিচার—সে-কথা ভুলে গেছি। এটা আমাদের বাঙালি ন্যাকামো ছাড়া আর কিছুই না। ঔপন্যাসিক হিসেবে বিচার করতে গেলে, বঙ্কিমকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লেখক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

সাহিত্যের বিচার করতে গেলে, দুটি দিক দেখা দরকার। সাহিত্য যেহেতু ভাষাশিল্প, তাই ভাষার ব্যবহারে কতখানি সৌন্দর্য ফুটেছে সেটাই প্রধান বিচার্য হওয়া উচিত। আর-একটি দিক আছে, কাব্য বা কাহিনী নির্মাণে মানবজীবনের কতখানি সত্য ফুটে উঠেছে, তার বিচার। বাংলা ভাষায় বঙ্কিম নিঃসন্দেহে প্রথম বড় ঔপন্যাসিক, সুষ্ঠু এবং সুললিত গদ্য রচনায় যে তিনি প্রথম একটি বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন, সে-কথাও অবশ্যস্বীকার্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বঙ্কিম নিজেই বলেছেন উপন্যাস আর ইতিহাস এক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি কালে সীমানা পেরিয়েও রসোত্তীর্ণ থাকতে পেরেছে কিনা—সেটা বিচার করে দেখা নিশ্চিত দোষের নয়।

বঙ্কিমের উপন্যাস ভাষা-প্রধান নয়, কাহিনী-প্রধান। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী মাঝে-মাঝে প্রকৃতি বা নারীর রূপ বর্ণনায় তিনি একাধিক পরিচ্ছেদ ব্যয় করলেও দ্রুতগতির একটি নাটকীয় কাহিনীর বর্ণনার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। কোন ঔপন্যাসিকের যেমন আগাগোড়াই ভাষাকে নিখুঁত এবং সৌন্দর্যময় করার দিকে লক্ষ্য থাকে (যেমন রবীন্দ্রনাথ বা ফ্লবেয়ার)—বঙ্কিম সেই ধরনের লেখক নন, বরং চার্লস ডিকেন্স বা শরৎচন্দ্রের মতন কাহিনীর বিন্যাসের দিকেই তাঁর প্রধান আগ্রহ। এই কাহিনীগুলিকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়। কয়েকটিতে তিনি স্পষ্টভাবে একটা আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছেন, কয়েকটি নিতান্তই মনোরঞ্জনী উপন্যাস। তাঁর সব-ক'টি উপন্যাস পড়ে আমার এই গভীর দুঃখের উপলব্ধি হল যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একটি উপন্যাসেও আমাকে তৃপ্ত করতে পারলেন না। তার প্রত্যেকটি কাহিনী কৃত্রিম এবং উদ্ভট—যেন মানসচক্ষে তিনি হিন্দি সিনেমা নামক একটা জিনিসের কথা জানতে পেরে তারই কাহিনী বানিয়ে গেছেন। তিনি যে-আদর্শের কথা প্রচার করেছেন, তার প্রত্যেকটিই ভ্রান্ত—এবং তার একটিও পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়নি। হলেই বরং দেশের আরও বিপদ ঘটত। তাঁর অন্তত দুটি উপন্যাস আমাদের দেশ ও সমাজের অনেকখানি ক্ষতি করে গেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

জানি, সকলে আমার সঙ্গে একমত হবেন না। আমি এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আরও কয়েকটি সংখ্যা ধরে লিখব। অনুগ্রহ করে সেগুলি ধৈর্য ধরে পড়ে তারপর আমার বিচার করবেন।

১

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কবিতার বই বেরোয় তাঁর আঠার বছর বয়সে। এর আগে মাত্র পনের বছর বয়সেই তিনি 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কবিতা রচনা করে কুড়ি টাকার এক পুরস্কার পান। এবং সে-কবিতাটি স্ত্রীলোক বিষয়ক। সচরাচর পনের বছরের ছেলের এ-রকম কবিপ্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কিশোর বয়স থেকেই তাঁর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল।

মাঝখানে কিছুদিন পড়াশোনা ও চাকরিবাকরির কারণে তিনি লেখা-টেখার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি। সাত-আট বছর তাঁর কোন সাহিত্যরচনার চিহ্ন নেই। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে, চাকুরিজীবনে খানিকটা স্থিত হয়ে তিনি ইংরেজিতে শুরু করলেন একটি উপন্যাস। এটা লিখতে-লিখতে হঠাৎ একসময় মত বদল করে ফেললেন, ইংরেজি ছেড়ে বাংলায় নতুন উপন্যাস রচনার কথা চিন্তা করলেন এবং অবিলম্বে শুরুও করে দিলেন। বঙ্কিমের এই সিদ্ধান্ত-বদল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মাইকেলের ভাষা-বদলের তুলনায় বঙ্কিমের এই ভাষা-বদল, আমার মতে, আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম বাংলা উপন্যাসটি বঙ্কিম লিখেছিলেন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে। এই বয়সে একটি গ্রন্থ লিখে সারা দেশে আলোড়ন তোলা কম কৃতিত্বের কথা নয়। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এ-রকম ঘটনা খুব বেশি নেই। এখনকার কোন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলে পারবে এ-রকম কোন কাণ্ড ঘটাতে? তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার বাল্য-বিবাহের যুগে পুরুষমানুষেরও জীবন শুরু হত অনেক তাড়াতাড়ি। অল্প বয়স থেকেই দায়িত্ব নিতে হত, বুদ্ধিরও বিকাশ হত দ্রুত। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও হয়েছিলেন মাত্র কুড়ি বছর বয়সে। এখন ঐ-বয়সী কোন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কথা চিন্তা করা যায়? এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও আগে পর্যন্ত একজন পঁয়তিরিশ-চল্লিশ বছরের বাঙালি ভদ্রলোক বলতে বোঝাত একজন ধীর স্থির সামাজিক মানুষ, যাঁর মতামতের পাঁচজন মূল্য দেয়, কয়েকটি সন্তানের পিতা এবং দায়িত্ববান নাগরিক। এখন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের লোকেও গায়ে চক্রাবক্রা জামা পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খায়, পার্কে প্রেম করে। এখন যৌবনের বয়স অন্তত দশ-পনের বছর বেড়ে গেছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সময় বাঙালি পাঠকদের মধ্যে যে কী বিপুল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল, তা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। সমসাময়িক বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্যেও আমরা তা জানতে পেরেছি। এর আগে গদ্যে লেখা একটি রুচিশীল তৃপ্তিকর দীর্ঘ কাহিনীর তো অস্তিত্বই ছিল না। বিলিতি উপন্যাস তখন সদ্য এ-দেশে আসতে শুরু করেছে। বাংলা ভাষাতেও যে এ-জিনিস লেখা সম্ভব, বঙ্কিমের আগে কোন পাঠকও বোধহয় তা কল্পনা করেননি। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাবের তারিখটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে নিশ্চিত লেখা থাকবে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনীটি অবশ্য নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। অনেকটা রূপকথার ধরনের, ভাবালুতার ভাগ খুব বেশি, চরিত্র ও ঘটনার বিন্যাস খুবই কৃত্রিম। এই একধরনের কাহিনী, যার টান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে, কিন্তু তার বেশি আর-কিছু থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসটি ছাপার আগে কিছু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের শুনিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভাষার ব্যাকরণের কোন দোষ আছে কিনা? পণ্ডিতরা বলেছিলেন, গল্প ও ভাষার বর্ণনাশক্তিতে এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে অন্য কোনদিকে মনই দিতে পারিনি।

স্কটের 'আইভান হো'র সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনীর মিল কতখানি, সে প্রসঙ্গ এখন অবান্তর। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, ঐ-বই লেখার আগে তিনি স্কট পড়েননি। তাঁর সমসাময়িক কালীনাথ দত্ত লিখেছেন, 'আমি তাঁহার অনেষ্টি আন্ইমপীচেবল্ বলিয়া বিশ্বাস করি।' আমরাও সেই বিশ্বাস করি।

তবে, প্রথম উপন্যাস থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি দুর্বলতা একেবারে দারুণভাবে আঁকড়ে ধরলেন। বঙ্কিম ইংরেজি সাহিত্যে কৃতবিদ্য হলেও, মনে হয়, সেক্সপীয়রের কাছ থেকে তিনি বইয়ের ঘটনাবিন্যাস ছাড়া শিক্ষণীয় আর-কিছু পাননি। তাঁর প্রিয় ছিল লেখক, কবিকুল এবং রোমান্স লেখকগণ, হৃদয়-রহস্য বলতে তিনি হৃদয়-উচ্ছ্বাসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর প্রিয় সব-কটি উপন্যাসেই দুটি নায়িকা। এদের মধ্যে একজন অতি কোমল, অতি পবিত্র একেবারে কুসুমপেলব যাকে বলে, এদের কাজ মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। আর-একটি মেয়ে বেশ তেজস্বিনী, যাকে বলে দস্যি মেয়ে, এর কাজ রাতদুপুরে পুরুষের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান। বঙ্কিম যে-যুগের কথা লিখেছেন, সেই যুগের মেয়েরা সন্ধের পর রাস্তায় বেরোত কিনা সন্দেহ— কিন্তু বঙ্কিমের এইসব নায়িকারা মধ্যরাতে রাস্তায় বেরুবেই, তা-ও একা, এবং মাঝে-মাঝেই পুরুষের ছদ্মবেশ ধরে কী করে যে অবলীলাক্রমে এরা অন্যের চোখে ধুলো দিয়েছে, তা-ও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। এই বাতিক বা মুদ্রাদোষটা তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারেননি। কোন বড় লেখকের এ-রকম ধারাবাহিক মুদ্রাদোষের উদাহরণ চোখে পড়ে না।

'দুর্গেশনন্দিনী' নাম দেখে বুঝতে হয় যে এই উপন্যাসের নায়িকা তিলোত্তমা। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে তাকে মাত্র তিন-চারবার দেখা গেছে। একবার মন্দিরের অন্ধকারে। এরপর দু-বার সে জগৎসিংহের মুখোমুখি হয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। তারপর তাকে দেখা গেল গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়, রাজকুমারের সঙ্গে শেষকালে বিয়ে হওয়ায় তাররোগ সারল। গোটা উপন্যাসে তিলোত্তমার মুখে এমন একটাও উক্তি নেই, যা মনে দাগ কাটে। এই তুলনায় বিমলা চরিত্রটি জুড়ে আছে উপন্যাসের সিংহভাগ, সে কতরকমের অ্যাডভেঞ্চার, শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি পর্যন্ত করেছে। সে প্রথমে ছিল দাসী, পরে নায়িকার সৎমা, শেষে পাগল।

এক হিসেবে 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস থেকে আলাদা। তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে আর-একটি দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, যা তিনি অবিলম্বেই সংবরণ করে নেন। এই উপন্যাসেও যবন সম্পর্কে কিছু-কিছু বক্রোক্তি থাকলেও তিনি ওসমান ও আয়েষা চরিত্রদুটিকে যথেষ্ট সমবেদনার সঙ্গে মহৎ ও মহিয়সী করে তুলেছেন। পরে আর কোথাও, বঙ্কিমচন্দ্র আর কোন মুসলমান চরিত্রের প্রতি সামান্য মায়া-দয়াও দেখাননি।

চরিত্রচিত্রণে তিনি সব সময়েই সাদা ও কালো এই দুটি রং ছাড়া আর কোন রং ব্যবহার করতেন না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের প্রসঙ্গ এলেই তিনি হয়ে উঠতেন ঘোরতর সাম্প্রদায়িক। কোন-কোন প্রবন্ধে বাংলার সাধারণ দরিদ্র চাষীদের প্রসঙ্গে তিনি হিন্দু ও মুসলমান চাষীকে সমান মূল্য দিয়েছেন, এ-কথা ঠিক। কিন্তু উপন্যাসে কোথাও রেয়াৎ করেননি। তাঁর মুসলমান-বিদ্বেষ তাঁর নারী-বিদ্বেষের চেয়েও উগ্র। সাহিত্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন করায় তিনি বাঙালি হিন্দু লেখকদের মধ্যে প্রথম এবং অদ্বিতীয়।

২

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি সম্পর্কে অনেকেরই বেশ দুর্বলতা আছে। আমারও ছিল। বাল্যকালে পাঠক হিসেবে আমিও কপালকুণ্ডলার প্রেমে পতিত হয়েছিলাম। প্রথম দর্শনে বড় অপরূপ, রহস্যময়ী এই বালিকা। কিন্তু উপন্যাস হিসেবে এটি একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যর্থ বই।

চাকরিতে ঢুকে বঙ্কিম বিভিন্ন জেলায় স্থানান্তরিত হচ্ছিলেন। প্রথম যশোর, তারপর কাঁথি। মেদিনীপুরে এসে খুব সম্ভবত তিনি প্রথম সমুদ্র দর্শন করলেন। প্রথম সমুদ্র দর্শনের অভিজ্ঞতা সকলের জীবনেই চমকপ্রদ! তাঁর কবিহৃদয় নিশ্চিত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। সমুদ্র, বালিয়াড়ি, অরণ্য, এই পটভূমিকায় তিনি তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসটি রচনা করার কথা চিন্তা করছিলেন কিছুদিন ধরে। একজন সন্ন্যাসী এইসময় প্রায়ই রাত্তিরবেলা এসে তাঁকে জ্বালাতন করতেন। সেই চরিত্রটিও মাথায় গেঁথে যায়।

মাঝখানে একটা ছুটিতে বঙ্কিম বাড়িতে এসেছেন। আড্ডা দিতে বন্ধু-বান্ধবরা আসেন
মাঝে-মাঝে। একদিন দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র ও আরেক ভাইয়ের সঙ্গে খোশগল্প হচ্ছে, এরই
মধ্যে বঙ্কিম হঠাৎ দীনবন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মনে কর, সমুদ্রের ধারে জঙ্গলের মধ্যে
এক কাপালিক একটা মেয়েকে মানুষ করছে বাচ্চা বয়েস থেকে। মেয়েটার যখন ষোল বছর
বয়েস তখন পর্যন্ত সে কাপালিক ছাড়া আর কোন মানুষ দেখেনি। সমাজের কিছুই জানে না।
পরে যদি কেউ সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে সমাজ-সংসারে নিয়ে আসে, তাহলে কি মেয়েটি
মানিয়ে নিতে পারবে? কাপালিকের প্রভাব কি চলে যাবে?

এ-কথা শুনে দীনবন্ধু কী উত্তর দিয়েছিলেন, দুঃখের বিষয় তার কোন রেকর্ড নেই।
পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন, দীনবন্ধু নাকি নীরব ছিলেন। আমার বিশ্বাস হয় না। দীনবন্ধু যে-রকম
সুরসিক ও ঠোঁটকাটা ছিলেন, তাতে এই অবস্থায় একেবারে চুপ করে থাকবেন বলে মনে হয়
না। প্রশ্নটাও এমন-কিছু জটিল নয়, প্রত্যেকেরই এক-একরকম মতামত থাকতেই পারে।

যাই হোক, সঞ্জীবচন্দ্র জিনিসটাকে হালকাভাবে উড়িয়ে দেন। স্বভাবসুলভভাবে তিনি
বললেন, কী আর হবে! প্রথমে কিছুদিন সন্ন্যাসীর কথা খুব মনে থাকবে। তারপর বাচ্চা-কাচ্চা
হলে, স্বামীর সঙ্গে ভাবসাব হলে গিন্নিবান্নি হয়ে পড়বে—সন্ন্যাসীর কথা একেবারে ভুলেই
যাবে।

বোঝাই যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্রের ফ্রয়েড-প্রীতি ছিল না!

বঙ্কিম কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি উপরোক্ত বিষয় নিয়ে লেখেননি। উপন্যাসে মূল
প্রশ্ন এই নয় যে মেয়েটি কাপালিককে ভুলতে পারবে কিনা। তারচেয়েও বড় প্রশ্ন কাপালিক
ঐ-মেয়েটিকে ভুলতে পারবে কিনা!

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমের অস্থিরচিত্ততার নমুনা পদে-পদে। তিনি কিছুতেই
মনঃস্থির করতে পারছেন না। মনে হয় যেন তিনি এই মেয়েটিকে ভয় পাচ্ছেন, ক্রমশই এর
থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। এই উপন্যাসে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ (আগে আর-একটি বেশি ছিল,
কোন কারণে বঙ্কিম সেটি বাদ দিয়েছেন)—মধ্যে মাত্র দশ-এগারটি পরিচ্ছেদে আমরা
কপালকুণ্ডলাকে দেখতে পাই। আর তিনটি পরিচ্ছেদে তার নাম উল্লেখ আছে মাত্র।
উপন্যাসটির অধিকাংশ জায়গা জুড়ে সে যে কত রোমহর্ষক কাণ্ড করেছে তার আর ঠিক
নেই! ঔপন্যাসিক জীবনের শুরু থেকেই বঙ্কিম এই ফর্মুলা নিয়ে নিয়েছেন যে একটি সরল
নিষ্পাপ মেয়ে থাকলেই আর-একটি ডানপিটে, মুখরা, ছদ্মবেশ ধারণে পটীয়সী মেয়ে
দেখাতেই হবে। অধিকাংশ উপন্যাসে লেখক এই দ্বিতীয় মেয়েটিকে নিয়েই মেতে উঠেছেন
বেশি, পৃষ্ঠাসংখ্যা সে-ই বেশি পেয়েছে—যদিও শেষ পর্যন্ত সে এলেবেলে হয়ে যায় কিংবা
পাগল হয় কিংবা হঠাৎ মরে। কিছুই সে পায় না।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের আরম্ভ অপূর্ব সুন্দর। তীর্থযাত্রীতে বোঝাই একটি নৌকোর পথ
হারানো কিংবা সমুদ্রে কুয়াশার বর্ণনায় বঙ্কিমের প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।
নবকুমারের চরিত্রটিও প্রথম দর্শনে বেশ মনোহর, তীর্থদর্শনের চেয়ে প্রকৃতি-দর্শনে তার বেশি
আনন্দ এবং ভদ্রলোকের মতন পরোপকারী। নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রথম
সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি বাঁধিয়ে রাখার মতন। নায়ক-নায়িকার উদ্বোধনী সংলাপ, "পথিক তুমি
পথ হারাইয়াছ?"—এর তুলনা পাওয়া ভার। সামান্য অতি-নাটকীয়তা সত্ত্বেও কবিত্বের
সৌরভময়। গোটা উপন্যাসে এর চেয়ে ভাল অংশ আর নেই—আদৌ আর কোন অংশ ভাল
নেই।

কাপালিকটিকে প্রথম থেকেই যাত্রাদলের কাপালিক বলে মনে হয়, যে অকারণে সংস্কৃত
কথা বলে। এবং বাচ্চাদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর মতনই তার ক্রিয়াকলাপ একটু
বেশিরকমের ভয়াবহ। যাই হোক, সেটাও আমরা ভুলতে পারি কপালকুণ্ডলাকে দেখে।

সমুদ্রের ধারে বসে আছে নবকুমার, তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, সামনে অনবরত ঢেউ এসে
ভেঙে পড়ছে। এই অবিরাম ঢেউ পতনের দৃশ্যে সময় যেন থেমে থাকে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে
নবকুমার দেখল এক অপূর্ব নারীমূর্তি। রাশি-রাশি কালো চুলে ঢাকা যার দেহ, যার দৃষ্টি স্থির
অথচ সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর জ্যোৎস্নার খেলার মতন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল।

বর্ণনা দেখে মনে হয়, প্রথমে কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিম প্রকৃতই একটি অরণ্য-বালিকা হিসেবে
সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। পুরুষ দেখে যার লজ্জার উন্মেষ পর্যন্ত হয়নি। যতদূর মনে হয়,
কপালকুণ্ডলার পরনে কোন পোশাক নেই। এই ব্যাপারে বন্ধুদের সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে
অনেকবার। কিন্তু বর্ণনা আছে, কপালকুণ্ডলার রাশীকৃত চুলে তার শরীরের কতখানি অংশ
ঢাকা পড়েছে। পোশাকের কথা নেই। কাপালিকের প্রসঙ্গে আছে, তার কোমরে একখণ্ড
'শার্দুল-চর্ম' আটকান—কপালকুণ্ডলার বর্ণনায় সে-কথা বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, একটি
আলাদা বাক্যে, 'রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ'! জঙ্গলের মধ্যে একটি মেয়ে গয়না-গাঁটি
পরবে, আমরা আশাও করিনি। বনের মেয়ের পক্ষে ফুল-টুলের গয়না পরাও খুব স্বাভাবিক
নয়—বিশেষত গয়না সম্পর্কে যার কোনরকম ধারণা থাকারও কথা নয়। এবং 'একেবারে'
শব্দটি এবং আলাদা বাক্য লক্ষণীয়।

অবশ্য একটু পরেই বঙ্কিম তাঁর মত পাল্টে ফেললেন। কপালকুণ্ডলাকে আর অতটা
অরণ্য-বালিকা রাখতে চাইলেন না। দুই পরিচ্ছেদ পরেই আমরা জানতে পারলাম যে সে
প্রায়ই কিছুটা দূরের এক আধা-শহরে জায়গায় অধিকারী নামে একজন লোকের কাছে আসা-
যাওয়া করত। এমন-কি সে রাতদুপুরে এলেও অধিকারী অবাক হয় না। তাহলে কপালকুণ্ডলা
নিশ্চিত শাড়ি পরে, ভাত খায় এবং বাইরের লোকদের চেনে। কাপালিক সম্পর্কেও আমরা
আগেই এ-রকম সন্দেহ করেছিলাম, তাকে 'আসব' পান করতে দেখে। নিশ্চয়ই তাকেও শহরে
আসতে হয় মদ কেনার জন্য। কিংবা শহরে ব্যাপারীরা তার আশ্রমে যাতায়াত করে।

কপালকুণ্ডলার প্রথম-দেখা রূপটা বঙ্কিমচন্দ্র পরে বার-বার কটুভাবে ভেঙে দিয়েছেন।
চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছবার জন্য তাঁকে খুবই দুর্বলভাবে একটা চিঠির আশ্রয় নিতে হয়েছে
বলে, বঙ্কিম হঠাৎ শেষের দিকে তাড়াহুড়ো করে বলে দিয়েছেন যে কপালকুণ্ডলা অধিকারীর
কাছে লেখাপড়াও শিখেছিল। হায়। কোথায় সেই অরণ্য-বালিকা! যে চুপচাপ বসে-থাকা
একজন লোককে জিজ্ঞেস করেছিল, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' বঙ্কিম একে সহ্য করতে
পারলেন না, হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলেন।

মতিবিবির যাবতীয় মতিগতি এবং কার্যকলাপ এতই বিরক্তিকর যে সে-সম্পর্কে আর
বেশি-কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। তবে, এই প্রসঙ্গে আবার সেই কথাটি বলা যায়। বঙ্কিম
রাতদুপুরে রাস্তায় মেয়েদের বার করতে বড় ভালবাসতেন। এ-ব্যাপারে তাঁর অসম্ভব দুর্বলতা
ছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা রাত্তিরবেলা ঘোরাঘুরি করেছে। 'কপালকুণ্ডলা'য় মতিবিবি
ওরফে পদ্মাবতী এবং মৃন্ময়ী ওরফে কপালকুণ্ডলা দু-জনেই রাত্তিরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে
জঙ্গলে পর্যন্ত গেছে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে সব-কটি মেয়েই রাত্তিরে ছাড়া যাতায়াত করে না।
এর মধ্যে মনোরমা আবার ঘোর রাতে রাস্তার ধারে পুকুর-পাড়ে বসে হাওয়া খায়! 'বিষবৃক্ষে'
হীরা, কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী—সবাই গভীর রাত্রে একা-একা পথ দিয়ে যায় ('কপালকুণ্ডলা'য়
যেমন একটি মেয়ে পুরুষের ছদ্মবেশ ধরেছিল, এ-উপন্যাসে আবার একটি পুরুষ মেয়ের
ছদ্মবেশ ধরেছে।) 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনী তো বটেই, নবাবপত্নী দলনী পর্যন্ত মধ্যরাতে পুরুষ
সঙ্গী ছাড়া রাস্তায় ঘোরে। এইরকম পর-পর উপন্যাস ধরে দেখান যায়—কী ঐতিহাসিক, কী
সামাজিক পটভূমিকায় বঙ্কিমের নায়িকারা রাতের অন্ধকারে অবলীলাক্রমে বাইরে ঘোরাঘুরি
করতে খুব ভালবাসে।

আসলে, বঙ্কিম যখন লিখছেন, তখন পর্যন্ত ভারতে ছিল ঘোরতর পর্দা প্রথা। কী হিন্দু, কী

মুসলমান পরিবারের মেয়েদের বাইরে-বেরুনো প্রায় একরকম নিষিদ্ধই ছিল। কচিৎ ভ্রমণকালে খুব ভালরকমের ঘেরা-টোপের ব্যবস্থা থাকত। সুতরাং রাস্তায় যে-কোন সময় একা কোন মেয়েকে দেখতে পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব। অথচ নায়ক-নায়িকার মাঝে-মাঝে দেখাশুনো না-হলে উপন্যাস জমে না। কাহিনীকে অতিনাটকীয় করার জন্য মেয়েদের মাঝে-মাঝে বাড়ি থেকে পালানোও দরকার। সেইজন্যই বঙ্কিমকে দিনের আলোর বদলে রাত্রির আশ্রয় নিতে হয়েছে। ঠিক যে-রকম আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ রোমান্স-লেখকদের রচনায় দেখি। উপন্যাস জিনিসটার কাঠামোর মতনই, রাত্রে ভ্রাম্যমাণা নারীরাও বিদেশ থেকেই এসেছে।

অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় 'কপালকুণ্ডলা'তে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই একমাত্র উপন্যাস, যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র একটি সন্ন্যাসীকে দেখিয়েছেন—যে-লোকটা আসলে খুব খারাপ। কাপালিকটির এত খারাপ হবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে একেবারে নরপিশাচ করে তোলা হয়েছে, যে নবকুমারকে মদ খাইয়ে পত্নী-হত্যার প্ররোচনা দেয়। বঙ্কিমের আর কোন উপন্যাসে এ-রকম চরিত্র নেই। এরপর বহু উপন্যাসে বহু সাধু সন্ন্যাসীর ছড়াছড়ি আছে। এক-এক সময় তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং অকারণ। সেই সব সাধুদের কাজ শুধু গালভরা উপদেশ দেওয়া—এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের উপদেশগুলি ভুল এবং শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও ভুল। মনে রাখতে হবে, সেইসময় বঙ্কিমের চেয়ে বেশি শাস্ত্রজ্ঞ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছেন এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেদকে পলগ্রেভ সাহেবের 'গোল্ডেন ট্রেজারি' নামক কাব্য সংকলনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বঙ্কিম ছিলেন তাঁর সময়ের পক্ষেও অনাধুনিক। এ-বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে।

'কপালকুণ্ডলা' রচনার আগে তরুণ বঙ্কিম একটি সাধুর দ্বারা ব্যতিব্যস্ত ও বিরক্ত হয়েছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গুরুবাদে তাঁর বিশ্বাসও দৃঢ় হয়। পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতেও এই ছাপ পড়েছে এবং তার ফল খুব সুখের হয়নি।

৩

আমি বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলাম, তার মাত্র দুটি কিস্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরই পাঠক সমাজে তুমুল সোরগোল ওঠে, অসংখ্য পত্রদাতা অভিশাপ বর্ষণ করেন আমার উদ্দেশ্যে, পত্রিকাটির প্রতিও রাশি-রাশি কটূক্তি ছুটে আসে জ্বলন্ত গোলার আকারে। পত্রিকাটির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও একেবারেই পছন্দ করেননি আমার মতামত। আমি বঙ্কিমের ভাবমূর্তিতে কলঙ্ক লেপন করছি, এমন অভিযোগ আসে। সুতরাং আমার রচনাটির প্রকাশ মধ্যপথে অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঘটনাটিতে আমি প্রভূত কৌতুক ও কিছু বিস্ময় বোধ করেছিলাম। ক্লাসিক রচনাবলী তো বার-বার নতুন কালের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যাচাই করা হয়, তাতে ক্লাসিকগুলির কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, এ-কালের মনোভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। আমার মতন সামান্য ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করতে চাইলেও আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণের বদ্ধমূল বঙ্কিম-প্রীতি দূর হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, সে-রকম কোন আলটপকা ধৃষ্টও আমার ছিল না। আমি কোন অন্যায় বা ভুল অভিযোগ করলেও যে-কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তিই তো তার সংশোধনী রচনা করতে পারেন। পরমত-সহিষ্ণুতা বোধহয় মানুষের ঠিক স্বভাবধর্ম নয়, ওটা নিছক কথার কথা।

আমাদের দেশে সাহিত্য আলোচনায় যে একটা দাঁতে দাঁত চেপে অতি সিরিয়াস ভঙ্গি থাকে, সেটি আমার পছন্দ না। সাহিত্য চরিত্র উন্নয়নের মাধ্যম কিংবা সাহিত্যিকরা

জ্যাঠামশাইদের মতন শ্রদ্ধেয়, এমনও আমি মনে করি না। সাহিত্য আনন্দের সামগ্রী, যেমন সঙ্গীত বা চিত্রকলা। সুতরাং খোলামেলা হাসিখুশি ভাবে একে গ্রহণ করাই আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। যাই হোক, পত্রিকায় আমার বঙ্কিম-বিষয়ক রচনা অসমাপ্ত থেকে যাওয়ার জন্য আমি সংকল্প নিয়েছিলাম পরে বঙ্কিম বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করব। ক্রমে মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর কেটে যায়, সঙ্কল্পের মধ্যে এসে যায় শিথিল অন্যমনস্কতা এবং আরও অনেক-কিছুর মতন এই কাজটিও দূর ভবিষ্যতের জন্য বরাদ্দ দিয়ে রাখি। কিন্তু যেহেতু মানুষের আয়ু পদ্মপত্রে নীরবৎ, তাই ইদানীং হঠাৎ চেতনা জাগল, বঙ্কিম-বিষয়ে আমার বাকি বক্তব্য আপাতত সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আমার অগাধ শ্রদ্ধা, অথচ তাঁর উপন্যাসগুলি তিনবার বা চারবার পাঠ করার পরও একটিও আমার পুরোপুরি পছন্দ হয় না। আগে অপছন্দের কথা ও কারণ ব্যক্ত করি। শ্রদ্ধার কথা পরে নিবেদন করা যাবে।

লেখকের সঙ্গে পাঠকের একটা সমমর্মিতা জন্মালেই সে-সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা বড় সুখের হয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম এ-কালের একজন পাঠক হিসেবে আমার সমধর্মী নন। তিনি যে-কালে এবং যে-পরিবেশে লিখেছেন তা সম্পূর্ণ মনে রেখেও এবং নিজের কাছে বারংবার প্রশ্ন করেও আমার এই সিদ্ধান্ত বদলাবার কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। বঙ্কিমচন্দ্র ঋষিপ্রতিম, তিনি স্বদেশীমন্ত্রের উদ্গাতা, এইসব কথাগুলি যে পরবর্তীকালে চালু হয়ে এসেছে, তা সত্যমিথ্যা যাই হোক, তাঁর উপন্যাসের মধ্যে এর কোন পরিচয় নেই। তাঁর প্রথমদিককার উপন্যাসগুলির কাহিনী অতি কৃত্রিম ও দুর্বল, চরিত্রগুলি অবাস্তব শুধু নয়, উদ্ভট, পরে ক্রমশ কাহিনীর বাঁধুনিতে তাঁর দক্ষতা জন্মায়, ঘটনার গতি আরও রোমহর্ষক হয় বটে কিন্তু শেষের দিকে উপন্যাসের মধ্যে নানারকম বক্তব্য প্রচারের অনাবশ্যক ঝোঁকও দেখা দেয়। এই ঝোঁক রসহানিকর এবং তাঁর বক্তব্যগুলি প্রতিক্রিয়াশীল। এ-সব বক্তব্যগুলি অগ্রাহ্য করে তাঁর উপন্যাসগুলি উপভোগ করা যায় বটে এবং এইসব বই যেহেতু আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারের স্থায়ী সম্পদের অন্তর্গত তাই দোষ-গুণ বিচার না করে এগুলি আমাদের অবশ্যপাঠ্যও বটে। কিন্তু উপন্যাস লিখে বঙ্কিম আমাদের দেশ বা সমাজের কোন উপকার করে গেছেন, এ-কথা মেনে নিতে আমি রাজি নই।

বঙ্কিম মোট চোদ্দখানি উপন্যাস রচনা করেছেন, সব-কটিই তাঁর চাকরি জীবনে। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর তিনি যেন এক অন্য মানুষ। বঙ্কিম যে-বৎসর চাকরিতে ঢোকেন, ঠিক তার আগের বৎসরই সিপাহী বিদ্রোহ হয়ে গেছে এবং কোম্পানির আমল বদলে ব্রিটিশ রাজত্ব এসেছে। কোম্পানির আমল ও ব্রিটিশ রাজ—এই দুই অবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থারও যে অনেক পরিবর্তন এসে যায়, তা সবারই জানা। প্রকৃত পরাধীনতা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব শুরু হয় বঙ্কিমের চাকুরির আমলেই। তখনকার পক্ষে অত্যন্ত শিক্ষিত, চরিত্রে সৎ ও দায়িত্ববান এবং আদর্শবাদী বঙ্কিম সরকারি কার্যেও ছিলেন অত্যন্ত পারঙ্গম। কিন্তু দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর চাকুরির পরও তিনি যে-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ঢুকেছিলেন, অবসর নিলেন সেই পদেই। চাকুরিকালে খবরের কাগজওয়ালা কিছু-কিছু সাহেব তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা করলেও শুধুমাত্র ভারতীয় বলেই বঙ্কিমের পদোন্নতি ঘটেনি এবং কয়েকবার কিছু দুঃশীল ইংরেজদের কাছে তাঁকে অপমানিতও হতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজদের ঘৃণা করতেন অন্তর থেকে, 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে ইংরেজ বা ইওরোপীয় পণ্ডিতদের সম্পর্কে তাঁর গভীর অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে, কমলাকান্তের রচনায় ও অন্যান্য প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজ ও ইংরেজ শাসনের প্রতি বর্ষণ করেছেন তীব্র বিদ্রূপ, কিন্তু চাকুরি জীবনে তিনি ইংরেজ-বিরুদ্ধ একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। চাকুরি জিনিসটাই একটা অরুচিকর কঠিন বাজ, চাকুরি বাঁচাবার জন্য অনেককেই অনেক-কিছু করতে হয়, সে-জন্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের

কোন দোষ ধরি না। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে তিনি ইংরেজের অনাবশ্যক জয়গান করেছেন বলে পরবর্তী যুগের উপন্যাসপাঠক হিসেবে আমরা তাঁর এই ব্যাপারটিকে উপন্যাস অভিজ্ঞের ত্রুটি বলেই নিশ্চিত গণ্য করব।

আমরা এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সামান্য তুলনা করতে চাই। বিদ্যাসাগর উপন্যাস-কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেননি, সুতরাং সাহিত্যিক হিসেবে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। তবে ঋষি, স্বদেশী মন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিমের সম্পর্কে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে দু-চার কথা বলা চলে নিশ্চয়ই। বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে ঋষি হননি, স্বদেশী মন্ত্রের উদ্গাতার সম্মানও কেউ তাঁকে দেননি। বিদ্যাসাগর মশাই পণ্ডিতী কাজও খুব কমই করেছেন। তাঁর জ্ঞান উজাড় করে কোন মহাগ্রন্থও লিখে গেলেন না। কয়েকটি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য খাটি-খাটনি করে জীবন ব্যয় করলেন। আমরা বিদ্যাসাগরের অনুগামী, তাই অনেক ব্যাপারেই বঙ্কিমকে সমর্থন করতে পারি না। এটা ঐ দুই বিশাল পুরুষের পু[illegible] জোর টানা নয়। বিদ্যাসাগর যুদ্ধ করেছেন দেশবাসীর সংস্কারমুক্তির জন্য। এই যুদ্ধে পৌরাণিক দেশে তিনি দেশবাসীকে কল্পনার ধর্মের আফিম পরিবেশন করেননি, এবং সাধারণ কয়েকটি কথা অবলম্বন করতে চেয়েছেন এবং কিছুটা পেরেছেনও; আর বঙ্কিম বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িয়েছেন ধর্মীয় জোর, প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন বহুবিবাহ, বিরোধিতা করেছেন বিধবাবিবাহ ও স্কুল-কলেজে স্ত্রীশিক্ষার। শুধু তা-ও নয়, দেশের সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন বিদ্যাসাগর, সে-সময় তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কিন্তু বঙ্কিম এ-ব্যাপারে কোন কার্যকর উৎসাহ দেখাননি। এমন কি যখন দেশীয় ব্যক্তিদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত করে সরকার শুধু কেরানী বানাবার শিক্ষা প্রসারের প্রস্তাব আনে, তখন স্বয়ং উচ্চশিক্ষিত হয়েও বঙ্কিম সমর্থন করেছিলেন সরকারি প্রস্তাব। দেশের বাকি উচ্চশিক্ষিত লোকেরা তখন ছিলেন সরকারের বিপক্ষে।

বিদ্যাসাগরও ইংরেজের অধীনে চাকরি করেছেন। প্রথম জীবনের একটি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে, সেটি মূলত অনুবাদ, তিনি ইংরেজ জাতির গুণগান করেছিলেন বটে কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এ-দেশে ইংরেজ শাসনের উপকারিতা-অপকারিতা সম্পর্কে ছিলেন নীরব। ইংরেজদের কাছ থেকে যতটুকু সুযোগ-সুবিধে আদায় করে দেশের উন্নতি করা যায়, সেইদিকেই ছিল তাঁর মন। শিক্ষা-বিস্তারের কাজে তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বাধা পান, এবং সেই সময়েই চাকরি জীবনে তাঁর পদোন্নতিতে সঙ্কট দেখা দেয়। বঙ্কিমের মতনই, তাঁকে ডিঙিয়ে এক শ্বেতাঙ্গকে দেওয়া হয় উপরের পদ। এজন্য বিদ্যাসাগর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি বটে, আবার বঙ্কিমের মতন দীর্ঘকাল মেনে নিয়ে চাকুরি চালিয়েও যাননি। বঙ্কিমের চেয়ে অনেক বেশি মাইনের চাকুরি তিনি সামান্য অজুহাত দেখিয়ে এককথায় ছেড়ে দেন। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর ইংরেজের দাসত্ব করতে যাননি।

রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের পর যখন কিছু-কিছু সংগঠনের চেষ্টা হয়, তখন বঙ্কিম বা বিদ্যাসাগর কেউই যোগ দেননি প্রকাশ্য রাজনীতিতে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর বঙ্কিম ও বিদ্যাসাগর দু-জনের কাছেই ডাক এসেছিল। বঙ্কিম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে কংগ্রেস শুধু কিছু শিক্ষিত লোকের সমাবেশ মাত্র, এর আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী অন্তঃসারশূন্য, দেশের সাধারণ মানুষের যোগদানের উপযুক্ত হয়নি। (দ্রষ্টব্য : 'বঙ্কিম রচনাবলী', সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, যোগেশচন্দ্র বাগলের ভূমিকা, পৃ. ২৪) বঙ্কিম নিজে সাধারণ মানুষ ছিলেন না, এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে কীভাবে সামিল করা যায়, তার কোন প্রস্তাবও তিনি দেননি। আর বিদ্যাসাগর কংগ্রেসের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন একটি সহজ কারণ

দেখিয়ে, উদ্যোক্তাদের তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, "দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে শেষ পর্যন্ত যদি দরকার হয় তারা কি তলোয়ার ধরতে পারে?" বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না-দিতে পেরে তারা বিব্রত হয়ে পড়ে; তখন বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "আমাকে বাদ দিয়াই তোমরা এই কাজে এগোও।" (ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে উদ্ধৃতি, ইন্দ্রমিত্র রচিত 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', পৃ. ১২) এরপরও দেশের সশস্ত্র বিপ্লবীরা বিদ্যাসাগরকে মনেও রাখেনি। বঙ্কিমচন্দ্রকেই তাদের দীক্ষাগুরু মনে করেছে। হায়, ইতিহাসের এইসব বাঁকগুলিকেই নিয়তির পরিহাস বলতে ইচ্ছে হয়।

বিদ্যাসাগর মূলত কর্মযোগী, বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত লেখক। বিদ্যাসাগরের আদর্শের প্রতিফলন তাঁর কর্মসাফল্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিকাশের পরিচয় তাঁর রচনায়। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের কর্ম ও আদর্শের নিন্দে করেছেন বারবার। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীর মুখ দিয়ে বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলিয়েছেন, পরে অন্য জায়গায় আবার 'তাহারা শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায়' বলেও কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ করেছেন। কেননা, বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে তেমন শাস্ত্রবিশারদ বলে মনে করতেন না। বিদ্যাসাগরের পরাশর-মত সমর্থন বঙ্কিমের ধারণায় ভুল। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে সমাজ-সংস্কারকদের উদ্দেশ্যে বজ্রপাত করতে চেয়েছেন, "যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ। তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?" শেষের দিকে বঙ্কিমের গোঁড়ামি উত্তরোত্তর বেড়েছে, যা-কিছু আধুনিক, তার ওপরেই তিনি খড়্গহস্ত, সমাজ সংস্কারের যে-কোন প্রচেষ্টাই তাঁর মতে হিন্দুধর্মের ওপর আঘাত। দিনের বেলা স্বামীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়াটাই তাঁর মতে অন্যায়। 'দেবী চৌধুরাণী'তে স্বয়ং লেখকই মাঝে-মাঝে মন্তব্য করছেন, "আমরা এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদের কথা লিখিতেছি না", কিংবা "প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ একাল!" বঙ্কিমের আমলেই নারীমুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে, বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা মেয়েদের অধিকার অর্জনের জন্য নানারকম প্রয়াস করছেন, আর সে-কালের সবচেয়ে সার্থক এবং সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক এর প্রতিরোধ করতে চাইছেন, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়? পরে অবশ্য "সাম্য" প্রবন্ধে তিনি দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শোচনীয় অবস্থা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসমাজের কাজের সামান্য প্রশংসা করে মুখরক্ষা করেছেন। কিন্তু উপন্যাসে তিনি ঘোরতর সনাতনপন্থী। এবং বিদ্যাসাগরের মতই ব্রাহ্ম সমাজকেও তিনি মনপ্রাণ দিয়ে অপছন্দ করতেন, তা সুবিদিত।

বহুবিবাহের নির্লজ্জ সমর্থন করেছেন বঙ্কিম তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' উপন্যাসে। বিদ্যাসাগরের মতের বিরুদ্ধে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন "বহু বিবাহ"। বিদ্যাসাগরের মতের বিরোধিতা করা তিনি কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য বঙ্কিমের নিন্দে করেননি কোনদিন, প্রকাশ্যে তাঁর প্রশংসাই করতেন। শুধু শোনা যায়, বঙ্কিমের উক্ত প্রবন্ধ পড়ে তিনি মনে দুঃখ পেয়েছিলেন, সেইজন্য বঙ্কিম কিছুদিন প্রবন্ধটির পুনঃপ্রকাশ করেননি, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরই তিনি সেটি আবার ছাপতে দেন।

'বন্দেমাতরম্' পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির ধ্বনি এবং 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটিকে একসময় বাঙালি বিপ্লবীরা গীতার মতন ভক্তি করেছে। যে-মানসিকতার ফলে ভারতবর্ষকে বাধ্য হয়ে বিভক্ত করা হল, তার উৎপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ 'আনন্দমঠে'র মতন উপন্যাসের রচনা এবং এই উপন্যাসের লেখককে 'স্বদেশী মন্ত্রের উদ্গাতা' হিসেবে গণ্য করা।

ছাত্র বয়সের পর বঙ্কিম আর কবিতাচর্চায় তেমন মন দেননি। তবু পরিণত বয়সে একদিন ঝোঁকের মাথায় আধা-সংস্কৃত আধা-বাংলায় একটি পদ্য রচনা করলেন, যেটিকে দেখে ছাপাখানার পণ্ডিত 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠার ফাঁক ভরাবার পক্ষে 'মন্দ নয়' বলে মন্তব্য করেছিলেন। পরে সেই 'বন্দেমাতরম্' পদ্যটিকে সুর দিয়ে গান করা হয় এবং আরও পরে

'আনন্দমঠ' লেখবার সময় তিনি ঐ 'বন্দেমাতরম্' গানটি ঐ-উপন্যাসে ঢুকিয়ে দেন। এই নির্দোষ প্রক্রিয়ার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

'বন্দেমাতরম্' গানটির প্রথমাংশ দেশবন্দনার কাব্য হিসেবে অতি উচ্চাঙ্গের। 'বন্দেমাতরম্' এই ধ্বনিও জাতীয়তাবোধ জাগাবার পক্ষে আদর্শস্থানীয় হতে পারত। দেশকে জননী বলা ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুযায়ী এবং মুসলমানদের এটা মেনে না-নেওয়ার কোন যুক্তি নেই, এবং মুসলমানরা শুধু দেশকে জননীরূপে দেখার কারণেই 'বন্দেমাতরম্'কে বর্জন করলে সেটা তাদের নিকৃষ্ট গোঁড়ামি বলে আমরা ধিক্কার দিতে পারতাম অনায়াসেই। কিন্তু ক্রমশ এই দেশজননীর রূপকল্পনা রূপান্তরিত হয়েছে সম্পূর্ণ এক হিন্দু দেবীর মূর্তিতে, মুসলমানরা সেই দেবীমূর্তির বন্দনা করতে কেন বাধ্য হবে? এবং এই 'বন্দেমাতরম্' গানটি রয়েছে এমন একটি গ্রন্থে, যে-গ্রন্থের মূল বক্তব্যই হল মুসলমানরা হিন্দুদের শত্রু। ইংরেজ বন্ধু কিন্তু মুসলমান শত্রু। যাতে কেউ এই বক্তব্য বুঝতে ভুল না করে তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্য তিনি স্পষ্ট করে উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় বলে দিয়েছেন সে কথা। মুসলমানদের রাজ্য ধ্বংস হয়েছে কিন্তু হিন্দু রাজ্য এখনও স্থাপিত হয়নি বলে সত্যানন্দের আফসোসের উত্তরে এক অলৌকিক চিকিৎসক জানিয়ে দিলেন যে, "যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুনবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। ...মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। ...শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।"

ইংরেজের জয়গান দিয়ে গ্রন্থ শেষ করলেন ইংরেজ-কর্মচারী বঙ্কিম। ভবিষ্যতের জন্য যে-আশা রাখলেন, তা-ও হিন্দু রাজ্য স্থাপনের। দেশের অর্ধেক লোক যে মুসলমান, তাদের তুচ্ছ করে দেওয়া হল। মুসলমান পাঠক ও সমালোচকরা 'আনন্দমঠ'কে অতি সাম্প্রদায়িক ও ক্ষতিকর গ্রন্থ বলে অভিহিত করলেও হিন্দু সমালোচকরা সে-সমালোচনার কিছুমাত্র মূল্য দিলেন না, তাঁরা 'আনন্দমঠে' খুঁজে পেলেন স্বদেশপ্রেমের সার্থক ছবি এবং 'বন্দেমাতরম্'কে করলেন জাতীয়তাবাদের মন্ত্র। এটা অতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। দেশের অর্ধেকসংখ্যক মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে এ কোন্ ধরনের দেশপ্রেম? বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রও একটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক লিখেছিলেন। 'নীলদর্পণে' চেষ্টা করেছেন দীনবন্ধু হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় মেলাতে, একটি প্রহসনে মাইকেলও তা-ই করেছেন, আর বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসগুলিতে অনবরত চেষ্টা চালিয়েছেন হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টির। বাঙালি জাতি ও তার মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ড করার জন্য কাঁঠালপাড়া-নিবাসী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কি কিছুটা পরিমাণে দায়ী নন?

মোট চোদ্দখানি উপন্যাসের মধ্যে একটিতেও বঙ্কিম কলকাতা শহর, নাগরিক জীবন বা সমসাময়িক কালের কোন পরিপূর্ণ চিত্র আঁকেননি। এ-ও বড় আশ্চর্য কথা। কোন মহৎ লেখক তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা বর্তমান কালকে নিজের রচনায় স্থান দিলেন না এ-ও যেন অভূতপূর্ব ব্যাপার। অথচ লেখক হিসেবে বঙ্কিম যে মহৎ ছিলেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

আমার অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সম্পর্কেই। তাঁর কোন উপন্যাসেরই কাহিনীর গঠন কিংবা প্রকট বক্তব্য আমার কাছে রুচিকর মনে হয়না। উপন্যাস ছাড়াও বঙ্কিম প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন তেরটি, এর মধ্যে তাঁর ধর্ম-বিষয়ক দুটি বাদ দিলে বাকি এগারোটি অতি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ।

সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণা স্পষ্ট: "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনের ব্যাপারে নানা লোকের নানা মতামত থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্য যে সৌন্দর্যসৃষ্টিরও বিষয়, সেটি বঙ্কিম জানতেন। মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন ঘটাতে গিয়ে তিনি নানান বিভ্রম ঘটিয়েছেন বটে, কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠাও দেখিয়েছেন তিনি। এইখানেই তিনি শ্রদ্ধেয়। প্রথম থেকেই তিনি বাংলা ভাষায় একটা উঁচু মান বেঁধে দিয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাহিনীর অবাস্তবতাও শেষ পর্যন্ত আমরা অগ্রাহ্য করে বইখানিকে প্রিয় বলে মেনে নিতে পারি, তার কারণ শব্দ ব্যবহারে ও ভাষাসৌন্দর্যে এর অনেক স্থান প্রকৃত কাব্যময় হয়ে উঠেছে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রচুর গাঁজাখুরি থাকা সত্ত্বেও শেষ দৃশ্যে মুমূর্ষু প্রতাপের কথা শুনলে শরীরে শিহরণ হয়। "সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল, বলিল, কী বুঝিবে তুমি, সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে!" তখন পাঠক এইটুকু অন্তত বুঝতে পারে যে এই লেখক জাত শিল্পী।

'বঙ্গদর্শনে'র মতন একটি পত্রিকা প্রকাশ করে বঙ্কিম সমগ্র বাঙালি জাতিকে কৃতজ্ঞ করে গেছেন। লেখক এবং সম্পাদকের তুলনা চলে না, কিন্তু লেখক বঙ্কিম মনুষ্যজাতির যত-না মঙ্গলসাধন করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি করেছেন সম্পাদক হিসেবে। 'বঙ্গদর্শনে'র কঠোর সুবিচার এবং সাহিত্য রচনার যে উচ্চমান বঙ্কিম নির্ধারণ করে গেছেন, তার ফলেই পরবর্তীকালের সাহিত্য অনেক সম্পদশালী হতে পেরেছে। সাহিত্যরুচিকে অতখানি পরিশীলিত করে দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথের মতন এমন সূক্ষ্মরুচির লেখককে আমরা এত তাড়াতাড়ি পেয়েছি।

বাংলা সাহিত্য যতকাল বেঁচে থাকবে, ততদিন বঙ্কিম এর পিতৃপুরুষ বলে গণ্য হবেন। কিন্তু আমরা 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বরের মতন, তার পিতার অন্যায় বা অসঙ্গত কথাগুলিও বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারব না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই মহৎ লেখকটি ছিলেন প্রাচীনপন্থী ও বিপরীতমুখী। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমাদের বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুগেই এমন একজন শক্তিমান ভাষাশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল।

হে সমালোচক

একদিন আমার কার্যক্ষেত্রের টেবিলের ওপর দেখলাম একটি পত্রিকা পড়ে আছে। যেমন অনেক পত্র-পত্রিকাই থাকে! কিন্তু সেই পত্রিকাটির অভিনবত্ব এই যে তার মলাটের ওপরেই বেশ কড়াভাষায় আমার সম্পর্কে কিছু ছাপা হয়েছিল। নিশ্চয়ই পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন যে ঐ-রচনা ভিতরে ছাপা হলে আমার চোখে না-ও পড়তে পারে। তাঁরা ঠিকই ভেবেছিলেন। এই ধরনের রচনা দু-চার লাইন চোখ বুলিয়ে চিনতে পেরে, আমি সরিয়ে রেখে দিই সাধারণত।

সেই পত্রিকাটি ডাকে আসেনি। কেউ হাতে করে এনে আমার অনুপস্থিতিতে সেটি রেখে চলে গেছে। অর্থাৎ যাতে প্রথমেই এসে আমার চোখে পড়ে। লেখাটি মলাট থেকে গড়িয়ে গেছে ভিতরের পৃষ্ঠায়, সেটুকু আর আমি পড়িনি, কিন্তু আমি চিন্তা করতে বসেছিলাম, এইধরনের সমালোচকের প্রকৃত মনস্তত্ত্ব কী? ১. তিনি বাংলা সাহিত্যের উপকার করবার জন্য কঠোরভাবে খারাপ রচনা নির্মূল করতে চান? ২. তিনি কি মনে করেন, তাঁর সমালোচনা পড়ে আমার মতন লেখকরা রচনার মান উন্নত করবার জন্য যত্নবান্ হবে? বা ব্যস্ত হয়ে পড়বে? ৩. তিনি ভুল করে একদিন বরবটি ভেবে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আচ্ছা, এর শোধ নেব? ৪. যারা 'আনন্দবাজারে'র সঙ্গে সংযুক্ত তাদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। ৫. শিশু যেমন বয়স্কদের সমাবেশে চ্যাঁচামেচি করে নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করায়, সেইরকম কিছু? ৬ অথবা, তাঁর সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে?

একমাত্র শেষোক্ত বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। জগৎ-সংসারে আমি এখন পর্যন্ত কারুর প্রতিই সচেতনভাবে ব্যক্তিগত শত্রুতার ভাব পোষণ করি না। সে-রকম কোনো কারণই এ-পর্যন্ত ঘটেনি। যদি কেউ আমার প্রতি তা পোষণ করেন, তবে সেটা নিতান্তই একতরফা এবং নিশ্চিত কোন ভুল বোঝাবুঝি-প্রসূত। কিন্তু বাকি পাঁচটি কারণ সম্পর্কে আমার খট্‌কা থেকে যায়।

লেখকের উচিত না কোন সমালোচনার উত্তর দেওয়া। যদি-না কোন তথ্যগত ভুল সম্পর্কে বিতর্ক থাকে। তবু আমি দু-একজায়গায় ভুল করে এ-রকম উত্তর দিয়ে ফেলেছি। দৈবাৎ কোন সমালোচনা পড়ে ফেলার পর আমার মনে হয়েছে, না, না, উনি ভুল বুঝেছেন আমাকে, আমি ও-রকম কথা বলতে চাইনি, এটা ওঁকে জানানো দরকার। পরে বুঝেছি, সেই জানানোটাও ভুল। আমার রচনার মধ্য দিয়ে যদি সঠিক জানাতে না পারি, তাহলে সংযোজনে জানাবার চেষ্টাটা হাস্যকর। আমি সে রকম হাস্যাস্পদ হয়েছি, বেশি না, দু-একবার মাত্র সমালোচকদের বিষয়ে এই আমার শেষ রচনা।

যে-কটি সমালোচনা এ-পর্যন্ত পড়েছি, তাতে আমার কোন উপকার হয়নি। ছাপার হরফে ব্যর্থ বিদ্রূপ, গালাগালমন্দ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ভেতরে-ভেতরে কিছু পোড়ে। কারণ আমার নিজের গালমন্দ করার অভ্যাস নেই। [illegible] যা পারে তাই-ই লেখে। তার থেকে ভাল লেখার ক্ষমতা তার নেই বা সেইসময় [illegible] ভাল লেখা একটা সাঙ্ঘাতিক

কঠিন কাজ, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত একজন লেখকও প্রকৃত ভাল লেখা লিখতে পারেনি। নীল সিন্ধুর ঠিক মাঝখানে এক ক্ষুদ্র প্রবাল দ্বীপে নিঃসঙ্গ বাতিঘর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃত ভাল লেখা। সকলেই সেইদিকে যেতে চায়। যে যে-পর্যন্ত পৌঁছয়। সাঙ্ঘাতিক পরিশ্রম ও অনেকখানি আয়ু ক্ষয় করে একটি রচনা সমাপ্ত করার পরও বুঝতে পারি, ঠিক জায়গায় পৌঁছন গেল না। তখন দুঃখ হয়। সেই দুঃখই পরবর্তী রচনাটির উৎস। আর, কেউ একজন কোনই পরিশ্রম না-করে এক কলমের খোঁচায় সেটা উড়িয়ে দিলে বলতে ইচ্ছে করে, তুমি অনধিকারী। জীবনানন্দ দাশ সমালোচকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, বরং নিজেও তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা! আজ পর্যন্ত এই রাগী সমালোচকরা কেউই একটিও সার্থক কবিতা লিখতে পারেনি।

প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু পড়ে ফেলা আমার অভ্যেস। এটা আমার জন্মরোগ। নির্বাচনের বিশেষ সুযোগ নেই, আয়ত্তের মধ্যে যা পাই তাই-ই পড়ি। যেটা ভাল লাগে না, মাঝপথে ছেড়ে দিই, কিন্তু দৌড়ে গিয়ে সেই লেখককে বলতে যাই না, শালা, কেন এত খারাপ লিখিস রে? বলতে যাই না, কারণ আমি জানি, এই খল্ সংসারে আমি জীবৎকালে আমার পাঠযোগ্য বইয়ের অভাব হবে না। তাই মাথাব্যথা নেই অপাঠ্য গ্রন্থ সম্পর্কে। আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, পত্র-পত্রিকায় যারা প্রায়ই গালমন্দ করে লেখে, তারা পরে কেউই নিজেরা লেখক হয় না।

'দেশ' পত্রিকাতে 'একা এবং কয়েকজন' নামে আমার একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সবেমাত্র যখন তিনটি কিস্তি বেরিয়েছে সেইসময় একদিন এক সুপণ্ডিত ও সমালোচক আমাকে বললেন, ও-উপন্যাসে আপনি কী লিখবেন আমি বুঝে গেছি! এবং অবিলম্বে সেই মর্মে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় উপন্যাসটি বিষয়ে খোঁচা মেরে লিখলেন। এ-প্রকার সমালোচনা সারা পৃথিবীর মধ্যে বুঝি বাংলাদেশেই সম্ভব। ঐ-উপন্যাসটি শেষ হয়েছিল মোট একশো সাত কিস্তিতে। মাত্র তিন কিস্তি পড়ে উপন্যাসটি বিষয়ে অবগত হওয়া স্বয়ং শার্লক হোমসের পক্ষেও অসাধ্য ছিল। কারণ, তা আমার নিজেরও জানা ছিল না। দু-একটি লক্ষণ দেখে আমার চিন্তার গতিবিধি নিরূপণ করা হয়তো কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনো-বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু উক্ত সমালোচকের সে-রকম কোন খ্যাতি নেই। সম্ভবত সেই ধীমান্ কৌতুক করতে চেয়েছিলেন।

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল 'অচলপত্র' নামে একটি পত্রিকার প্রতিসংখ্যায় একাধিক লেখককে পেড়ে ফেলতেন। তুলোধোনা করা যাকে বলে। কিন্তু ব্যাপারটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল খুব মজার। সবাই জেনে গিয়েছিল নানান্ তীব্র ঝাঁঝাল রসিকতা মিশিয়ে আক্রমণ করাই দীপেন্দ্রর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, তিনি ও ছাড়া আর কিছু জানেন না, তাঁর কাছ থেকে গভীর সুরের কোন কথা আশা করা যায় না, সুতরাং তাঁর পত্রিকার প্রতি সংখ্যাই বেশ রসিয়ে-রসিয়ে পড়া যেত। হায়, সেরকম ঝল্‌মলে রসিকতাবোধ ইদানীং আর সমালোচকদের মধ্যে দেখতে পাই না। কোথায় গেলেন সুরেশ সমাজপতি, সজনীকান্ত আর দীপেন্দ্রকুমারেরা?

কোন-কোন সমালোচক নিজেকে মার্কসবাদী বলে বিজ্ঞাপিত করেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ মূর্খ এবং ভণ্ড। প্রকৃত মার্কসবাদী সমালোচক এ-পর্যন্ত একজনও দেখিনি। মার্কসবাদ এদের কাছে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতন। স্বয়ং মার্কস এঁদের রচনা দেখলে শিউরে উঠতেন। মার্কস জানতেন সাহিত্যের মধ্যে রস জিনিসটা কী। বাংলা সমালোচকরা মার্কসবাদও বোঝে না, রসও বোঝে না। শুধু জানে গালাগাল, যার প্রতি ছত্রে অক্ষমের ঈর্ষা। হয়ত বাংলা মার্কসবাদীদের রচনা পড়ে খুশি হলেও হতে পারতেন লেনিন। লেনিন মহামানব ছিলেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর সাহিত্যবোধ ছিল না উচ্চাঙ্গের। সকলের সব-কিছু থাকে না, এমন-কি মহামানবদেরও থাকে না।

যাঁরা কোন বামপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত, সেইসব সমালোচকদের প্রতি বোধহয় একটা লিখিত বা অলিখিত নির্দেশ আছে যে নিজেদের দলের বাইরে যে-কোন লেখককেই নস্যাৎ করতে হবে। লেখার মধ্যে কী আছে না আছে, তার বিচার করার দরকার নেই, লেখক নিজের দলের কিনা এটাই আসল ব্যাপার। এর নাম সাহিত্য সমালোচনা। ব্যাপারটা তবু বোঝা যায়। এবং তাঁদের কাজটাও সহজ। যেহেতু অধিকাংশ বামপন্থী দলগুলির মধ্যেই একজনও লেখক নেই, সুতরাং তাঁরা চোখ বুজে সবাইকে গালাগাল দিয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে শৌখিন মার্কসবাদীদের নিয়ে। এরা কোন মিছিলে বা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয় না। এরা বুদ্ধিজীবী। পেশায় সাধারণত এরা অধ্যাপক, বিজ্ঞাপন-মুশাবিদাকারী, ব্যাঙ্ক-চাকুরে বা পত্রিকার সংবাদদাতা হয়, হিন্দীতে যাদের বলে পত্রকার। এরা যে যার চাকরি-বাকরির উন্নতির চেষ্টায় ব্যস্ত, কেউ টাকা জমিয়ে বাড়ি বানায়, বোনাস প্রভৃতি ব্যাপারে অত্যুৎসাহী, অথচ এরাই সমালোচনার সময় মসীধারণ করে গরিবের জন্য কাতর, গণতন্ত্রের প্রতি যড়্গহস্ত, এবং রাস্তার ভিখারীদের কথা লেখবার জন্য লেখককুল কেন ভিখারী হচ্ছেন না, এই দাবিতে গর্জমান্। এদেরই আমি ভণ্ড বলেছি। ইদানীং বঙ্গে এদের সংখ্যাই প্রভূত।

নকশাল আন্দোলনের চূড়ান্তকালে এক নকশাল যুবক আমাকে বলেছিল, এ-সব কী লিখছেন? এ-সব ছেড়ে দিন! নতুনভাবে লিখুন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই নতুন লেখা কীরকম হবে, কোন আভাস দিতে পার ভাই? সে লুকিয়ে এনে একটি সাম্প্রতিক চীনা উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ দিয়েছিল আমাকে। বইটি মুর্শিদাবাদে গোপনে ছাপা। বইখানি সমাপ্ত করার পর আমি বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসেছিলাম। এতখানি ধৈর্য আমি কোন উপন্যাস পাঠের জন্য আগে ব্যয় করিনি। পরে ছেলেটির সঙ্গে আবার দেখা হলে আমি বলেছিলাম, পৃথিবীর সব মানুষ খেয়ে-পরে বাঁচুক, ধন-বৈষম্য দূর হোক, শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপিত হোক—এটা আমিও মনে-প্রাণে চাই। এ-সব আনবার জন্য যদি সাহিত্যশিল্পকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই। মানুষের জীবনের চেয়ে আর কিছুরই দাম বেশি নয়। এ-দেশে সে-রকম সমাজের প্রতিষ্ঠা হলে আমি বরং স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রামে গিয়ে মাটি কাটব, কিন্তু এক লাইনও লিখব না। পড়বও না। ঐ-রকম উৎকট উপন্যাস আমি ছুঁয়েও দেখব না। উপন্যাসটিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এক জায়গায় ছিল যে, গ্রন্থের নায়ক সারাদিন বহুরকম ভাল-ভাল কাজে ব্যস্ত থাকায় সে-দিন সে মাও-সে-তুং-এর রচনাবলী পাঠ করতে গিয়েছিল ভুলে। স্বপ্নের মধ্যে সেই কথা মনে পড়ে যায় তার, সে ধড়ফড় করে উঠে বসে এবং শেষরাত্রে, ঘরের বাতি জ্বেলে সে মাও-এর রচনা পাঠ করতে বসে, পড়তে পড়তে তার চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

আমি পুরোপুরি নাস্তিক, এই নতুন ধর্মবাদও গ্রহণ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এর চেয়ে মাটি কাটা অনেক ভাল। সাড়ে তিন হাজার বছরের যে সাহিত্যের ট্র্যাডিশন, আমি সে-সাহিত্য ছাড়া অন্য-কিছুতে সেই স্বাদ পাব না, যে-সাহিত্য ব্যক্তি-মানুষের কথা বলে, যা একা-একা উপভোগ করবার। দারিদ্র্য নির্মূল করবার কাজে সাহিত্যকে হাতিয়ার করার মতন স্থূল চিন্তার অংশীদার হওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না ইহজীবনে। যে বিশ্বাস করে, সে করুক।

অনেকে বিশ্বাস করে না, বা করেন না, তাদের বা তাঁদের গল্পে কবিতায় থাকে ব্যক্তি-মানুষের কথাই, থাকে ভাষা-সৌন্দর্যের নেশা অথবা ভাষা নিয়ে মারপ্যাঁচ, কিন্তু সমালোচনা করবার সময় তারাই হঠাৎ দারুণ প্রগতিশীল হয়ে ওঠে, গরিব, এস্টাব্লিশমেন্ট, বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে দাপাদাপি করে। বিষ্ণু দে মার্কসবাদী, কিন্তু তাঁর কবিতাগুলি তাঁদের ভাষাতেই বুর্জোয়া সাহিত্য নিশ্চিত। আবার কোন লেখককে দেখি, এই সপ্তাহে এস্টাব্লিশমেন্টের জালে আবদ্ধ লেখকদের বিরুয়ে মর্মভেদী রচনা লিখে পরের সপ্তাহেই সে

সংবাদপত্রের রিপোর্টারি করতে পাহাড়ে চলে গেল! বড়ো কাগজ অর্থাৎ তথাকথিত এস্টাব্লিশমেন্টে লেখার চেষ্টা করেও সুযোগ না-পেয়ে, অথবা চাকরির চেষ্টা করেও চাকরি না পেয়ে হঠাৎ ঐগুলি শুরু করে দেয় প্রগতিবাদী সেজে কেউ-কেউ, এ-রকমও দেখেছি। কিন্তু এসব উল্লেখ করতে আমার লজ্জা করে। এসব দুঃখের কথা।

অপছন্দের সংবাদপত্রে কাজ করলেই কোনো লেখককে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঘোষণা করা নিছক বিকৃত মনের পরিচায়ক। সংবাদপত্রে চাকরি করলেও সকলেই সংবাদ রচনায় অংশগ্রহণ করে না। এ-দেশে লেখকদের এখনো চাকরি ছাড়া চলে না, এবং সংবাদপত্রে সময়ক্ষয় কিংবা স্কুল-কলেজে পড়ানো ছাড়া লেখকদের অন্য জীবিকা বিশেষ নেই। তা ছাড়া যদি কেউ বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হয়ে জুতো কিংবা বেতার-যন্ত্রের বিজ্ঞাপন লেখে, সেই আবার সংবাদপত্রসেবী সাহিত্যিককে নিন্দে করে কোন্ বিবেকে? অথবা, বিবেক না-থাকাই বোধহয় প্রগতিশীল সমালোচক হবার প্রধান শর্ত।

কোন লেখকের পক্ষে সমসাময়িক কালের সাহিত্যের সমালোচক হওয়া খুবই শক্ত কাজ। লেখকের নিজস্ব অহমিকাই প্রধান অন্তরায়। সেইজন্যই সিরিয়াস লেখকরা পূর্ববর্তী সাহিত্যের বিচার করেন,—টি এস এলিয়ট যেমন শেলী বিষয়ে, রবীন্দ্রনাথ যেমন মাইকেল বা বঙ্কিম বিষয়ে—কিন্তু সমকাল সম্পর্কে নীরব। এটাই শালীনতা। কিন্তু অনেকে এখন এটা মানেন না। এখন পরস্পর পিঠ-চাপড়ানি এবং পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি—দুটিই বেশ চলছে। ছাপা অক্ষর এখন আনকেপ্ট ওয়ার্ডস-এ ভর্তি। কথায় আছে, ব্যর্থ লেখকরা গুলি-খাওয়া বাঘ। তারাই সমালোচক। যে নিজে গল্প উপন্যাস কবিতা কিছুই লিখতে পারে না, সে-ই এগুলির নির্মম বিচারক সেজে বসে। এতে নতুনত্ব নেই। কিন্তু যে লিখতে পারে, অথচ লেখার জন্য সময় বা মেধা না দিয়ে তার অপব্যয় করে বনের মোষ তাড়ানোর কাজে, তার ব্যবহার কৌতূহলজনক। যেমন আমাদের এক বন্ধু। ছোটোছোট পত্র-পত্রিকায় সে নানান্ চুটকি লেখায় চৌকোষ ভাষায় অনবরত নিজের সময়কার লেখকদের নিন্দে করে যাচ্ছে। কী দারুণ কায়দা সে-সব রচনার, ভাষা যেন মাকড়সার জালে শিশিরবিন্দু, প্রতিটি শব্দ যেন ধানী লঙ্কা, পড়তে পড়তে আহা-আহা বলতে হয়। এখন কোথাও তার লেখা বেরুলেই অনেকে বলে, দেখি-দেখি, অমুক আবার কাকে দিল! দেখি-দেখি, ওমুক খোঁচাখুঁচির আর কত ভাল ভাষার কায়দা করল! প্রশংসার ভাষা সবসময়ই সীমাবদ্ধ, গালাগালির ভাষা যে কত অঢেল চমকপ্রদ হতে পারে, তার উদাহরণ আছে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'অপরাধ-জগতের ভাষা'য়। আমাদের এই বন্ধুর সংগ্রহ তার চেয়েও অনেক অভিনব। সে প্রায় দীপ্তেন্দ্রকুমারের জায়গা নিয়ে নিল, নিয়ে নিল! ছোটছোট পত্র-পত্রিকাগুলো অতি উৎসাহের সঙ্গে তাকে বলে, অমুক বা অমুকবাবু বা অমুকদা ঐ-রকম আর-একটা লেখা চাই, আরও মুচমুচে, আরও ঝাঁঝাল, আপনার যা দারুণ ভাষা না, পড়তে এত মজা লাগে! দেখা যাচ্ছে, বড়-বড় পত্রিকার মতন, ছোট পত্রিকাদেরও একরকম জাল আছে, যাতে জড়িয়ে পড়ে এক-একজন লোক। তাকে দিয়ে ইচ্ছে মতন লেখায়। যারা লিখতে পারে না, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যে লিখতে পারে, সে কেন এইসব এলে-বেলে কাজে সময় নষ্ট না করে নিজের নিজস্ব লেখা লেখে না?

ধরা যাক, কোন লেখকের দশখানি বই আছে। তার মধ্যে তিনখানি ভাল, পাঁচখানি চলনসই, বাকি দুখানি দুর্বল। এমন সমালোচনাও আমাদের চোখে পড়ে যে সেই লেখকের শুধু ঐ দুর্বল বইদুটি নিয়েই তাকে তুলোধোনা করা হয়েছে, বাকি লেখাগুলির কোন উল্লেখই নেই। এই লোকগুলি অতি অসৎ। অনেকে যেমন প্রাণখুলে হাসতে জানে না, তেমনি প্রাণখুলে কারুর প্রশংসাও করতে পারে না। এরা দুর্ভাগা, সত্যিই দুর্ভাগা।

আবার সমালোচক হিসেবে যাঁরা সিরিয়াস, তাঁরা একজন লেখকের কাছ থেকে কিংবা সাহিত্যের কাছ থেকে বড় বেশি আশা করেন। তাঁরা মনে করেন, দুঃখ, দারিদ্র্য, লোডশেডিং,

হিংসা, খরা, বন্যা—এই সবকিছুই সমাধান করে দেবে সাহিত্য। এমন সর্বরোগহর সাহিত্য কখনও রচিত হবে কিনা আমি জানি না। এবং হলেও কে বা কারা তা পড়বে?

বাংলা সাহিত্যের মান যদি এখন কিছুটা নিচু হয়ে থাকে, তা হলে বলতে হবে, তার একটি কারণ, বাংলায় স্বাস্থ্যকর সমালোচনা সাহিত্য বলে কিছু নেই। লেখকের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ করলে, সে লেখক ক্রুদ্ধ হয়, তাতে তার রচনার কোন উন্নতি হয় না। অপরপক্ষে, কোন লেখকের রচনাগুলির চুলচেরা দোষগুণ বিচার করলে, তাতে শুধু যে লেখকেরই উপকার হয় তাই নয়, তাতে পাঠকরাও শিক্ষিত হয়। আজকালকার লেখকের দুর্ভাগ্য এই যে তাঁদের শুধু নামহীন, অদৃশ্য পাঠকদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। দেশের বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, জ্ঞানী ব্যক্তিরা বর্তমান সাহিত্যকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন, তা জানবার কোন উপায় নেই, তাঁরা নীরব। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এখন ভাদ্রমাস, এইসময় কোকিল ডাকে না, কারণ এইসময় অন্য একটি প্রাণী বড় গোলমাল করে।

আমি মার্কসবাদের মূলতত্ত্বে বিশ্বাস করি। তবে আমাদের দেশের এগারোটি বা তারও বেশি পরস্পরবিরোধী মার্কসবাদী দলের বক্তব্য বুঝি না। শুধু গরিবের জয়গান আর বড়োলোকগুলোকে লম্পট আর খল দেখিয়ে একঘেয়ে রচনা লিখে গেলেই দেশের কোন উপকার হবে, এমন আমার কখনো মনে হয় না। ধর্মীয় কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা এমন-কি ভূতের ভয় ইত্যাদি দূর করার কাজেও আমাদের সাহিত্যের যদি কিছুটা প্রভাব পড়ে তাহলে তাতেও আমাদের মতন দেশে সমাজ পরিবর্তনের অনেকখানি কাজ হয় বলে আমার বিশ্বাস। সবচেয়ে বড় কথা, রচনাটি পাঠযোগ্য, রসসমৃদ্ধ হল কিনা। নইলে, যত মহা মহা বক্তব্যই থাক, নীরস রচনা দেখলেই বলতে ইচ্ছে করে, এহ বাহ্য, আগে কহো আর।

আমি সাহিত্যের মধ্যে আনন্দ ও সৌন্দর্য খুঁজি। বাকি জীবন তাই খুঁজে যাব।

অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও দ্বিধা

মানুষের স্বাধীনতা সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছে, যেদিন সে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করতে শুরু করেছে। পাথরের অস্তিত্ব পাথরের আয়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একটা পাথর শুধুই পাথর, যেটুকু আছে সেইটুকুই, তার চেয়ে বেশিও নয় কমও নয়, সেখানে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব তার আয়তন ও অবস্থানকে ছাড়িয়ে যায়। আজ আমি এই মুহূর্তে টেবিলের সামনে বসে আছি—কিন্তু এটাই আমার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব নয়—এর অগ্র-পশ্চাৎ আছে—এমন কি কখনো আমি নিজেকেও ছাড়িয়ে যাই, যেমন, অনেক সময় আমাদের মনে হয়—আমি যেন আমার নিজের মধ্যে নেই। এই অস্তিত্বেরই নাম জাঁ পল সার্ত্র দিয়েছেন Being for itself (Pour-soi)—যার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় না গিয়ে বাংলায় অতি সরলভাবে নাম দেওয়া যায় চৈতন্যময় অস্তিত্ব।

এই চৈতন্য বহু শতাব্দীর গোলকধাঁধায় ঘুরছে। এই চৈতন্যের স্বাধীনতা অর্জনের বিরুদ্ধে বারবার দুস্তর বাধা এসেছে, মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও বাণীও মানুষের চৈতন্যকে কম শুদ্ধিত করেনি। কিংবা কখনো কখনো কোন মহাপুরুষ মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতার দিকে কি পথনির্দেশ করলেও—অচিরকালের মধ্যেই তা আবার বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেছে। যেমন গৌতম বুদ্ধের নির্দেশ।

মানুষ চৈতন্যময় জীব—এবং তার প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে তাই বোঝায় — যখন সে তার চৈতন্যকে সম্পূর্ণ নিজস্ব পথে চালিত করতে পারে। যাকে আমরা বলি বিচারবুদ্ধি— সেই নিজস্ব বিচারবুদ্ধি দিয়ে সব কিছুই যাচাই করে নিতে না পারাই সীমাবদ্ধতা। এই পথে বাধা অনেক, যেমন পূর্বসংস্কার, ঐতিহ্য নামক দুর্বোধ্য বস্তু, প্রতিষ্ঠিত সত্য ইত্যাদি। কিন্তু চৈতন্যের পূর্ণ স্বাধীনতা আসতে পারে তখনই, যখন সে সব কিছুকেই স্বীকার করার আগে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করতে পারে। সার্ত্র-এর চেয়েও প্রাচীন এক ফরাসি, দেকার্ত তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব 'সিসটেমেটিক ডাউট'-এ যা প্রকাশ করেছিলেন।

দেকার্তে প্রস্তাব করেছিলেন, সব-কিছুর বিরুদ্ধেই 'না' বলতে হবে—আপাতত যত বিশ্বাসযোগ্যই হোক না-কেন—যতক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহ করার সুযোগ থাকবে, ততক্ষণ 'না'। এই না থেকে কারো রেহাই নেই—বস্তু-পৃথিবী থেকে শুরু করে, মানুষের সামগ্রিক মনীষা, পিতা-মাতার সম্পর্ক সব-কিছু। অর্থাৎ বিপরীতভাবে বলা যায়, যতই বিশ্বাসযোগ্য হোক-না কেন, যে কোন কিছু সম্পর্কে হ্যাঁ বলার লোভ সংবরণ করতে হবে। স্বাধীন চৈতন্য কখনো কণ্ঠাভজা হতে পারে না। যতক্ষণ না সে নিজস্ব বিচার ও চৈতন্যের আলোকে প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করে স্বীকার করতে পারে—ততক্ষণ সে 'না' 'না' বলে এগবে। সে এই বিশ্বপ্রকৃতি, এমন-কি নিজের শরীর ও স্মৃতিকেও অস্বীকার করতে পারে, একমাত্র পারে না নিজের চৈতন্যকে। চৈতন্যকে অস্বীকার করতে পারে না, কারণ অস্বীকার করা মানেই এ-সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা, এবং চৈতন্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা মানেই তাকে স্বীকার করা। সুতরাং

অস্বীকারের অসীম শূন্য জগতে শুধু থাকবে তার চৈতন্যের আলো। অর্থাৎ শূন্যতাকেই মানুষ আলাদা একটা জগৎ হিসেবে তৈরি করতে পারে।

দেকার্তে অবশ্য তার নিজের সময়কে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি অথবা চতুরতাবশত ছাড়িয়ে যেতে চাননি। এই যে 'না'-এর অসীম অন্ধকার শূন্যতা—মানুষকে তিনি এখানে ছেড়ে দেননি। এই শূন্যতার একপ্রান্তে তিনি বিরাজমান রেখেছিলেন ঈশ্বরকে। যাত্রাপথের শেষে ঈশ্বরই পরম সত্য। 'আমি চিন্তা করি তাই আমি বেঁচে আছি'। এবং মানুষ যে চিন্তা করতে পারে সেটাই প্রমাণ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব। —দেকার্তের এই যুক্তিকে পরম কুযুক্তি বলতে লোভ হয়। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের যে চরম স্বাধীনতার পথ তিনি দেখালেন—শেষ পর্যন্ত তিনিও ঈশ্বরকে 'হ্যাঁ' বললেন—সত্যিই কি নিজস্ব যুক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে কিংবা অন্য কারণে সে কথা বলা যায় না। তার সমকালে ঈশ্বরকে উড়িয়ে দিয়ে পাদরিদের কোপে পড়তে হয়ত চাননি তিনি—যার ফলে প্রাণ হারানোও অসম্ভব ছিল না—গ্যালিলিও যেমন শেষ পর্যন্ত বিচারকদের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, না, পৃথিবী ঘোরে না।

সে কথা যাক। দেকার্তের এই সিসটেমেটিক ডাউট আমাদের কালে অসত্য হয়ে যায়নি। ঈশ্বর এখন মৃত। তাঁকে অস্বীকার করার জন্য কষ্ট করে একম যুক্তি দেখাবারও দরকার হয় না। সেইসঙ্গে বহু মধুর বিশ্বাস ও রহস্যেরও মৃত্যু হয়েছে যেমন পরজন্ম, আত্মার অবিনশ্বরতা, পুণ্যের পুরস্কার বা পাপের শাস্তি ইত্যাদি। এখন জীবনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের যে যাত্রা—এর থেকে এইসব বাদ পড়ার ফলে—তা আরও কঠোর ও নির্মম হয়ে উঠেছে, এখন মানুষ শুধু নিজের নিয়ন্তা—নিজের জীবনই তার কাছে চূড়ান্ত। তাহলে মানুষের জীবনযাপনের উদ্দেশ্য কি হবে—সেটাই বড় প্রশ্ন।

ঈশ্বরের মৃত্যু হলে—মানুষ নিজেই সেই স্থান গ্রহণ করেছে। এই তত্ত্ব পাশ্চাত্যে কিছুটা অর্বাচীন হলেও আমাদের দেশে নূতন নয়। গৌতম বুদ্ধ মানুষের জীবন থেকে ঈশ্বরকে সরিয়ে নিয়ে এক অসীম শূন্যতার সন্ধান দিয়েছিলেন, কিন্তু এই শূন্যতাবোধ ও জীবনের নশ্বরতার সন্ধান দিয়ে মানুষকে তিনি নৈরাশ্যের সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে চাননি—তিনি ঈশ্বরের বদলে মানুষকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এক সহজ ধর্মে—পারস্পরিক সমভ্রাতৃত্ব ও সহনশীলতা। জীবনের যাত্রাপথের শেষে যেহেতু কোন চরম প্রাপ্তি নেই, সেইজন্য যাত্রাপথটুকুই পরস্পরকে ভালবেসে সুগম করা উচিত। যেন, এক বিশাল মহাসমুদ্রে একটি মাত্র নৌকোয় সবাই আমরা যাত্রী, যে মুহূর্তে আমরা জানতে পারব যে সেই সমুদ্রের কোন আরম্ভ বা শেষ নেই, কোথাও আমরা পৌঁছব না এবং কোন উদ্ধারকারী জাহাজ আসার কোনই সম্ভাবনা নেই—তখন পরস্পরের প্রতি সমবেদনা ছাড়া আর আমাদের করণীয় কিছুই থাকবে না। এই তত্ত্ব আপাতত অনেকটা গ্রহণযোগ্য মনে হলেও আধুনিককালে আমরা আর সকলেই এক নৌকোর আরোহী বলে মনে করতে পারিনা। প্রত্যেক মানুষই এক-একটি আলাদা দ্বীপ—এ কথাটা এখন বহু প্রচলিত, অথবা পূর্বের উপমা টেনে বলা যায়—সেই দিক-চিহ্নহীন অকূল সমুদ্রে প্রত্যেকেই এক-একটি আলাদা ক্ষুদ্র নৌকার যাত্রী—প্রত্যেকটিতেই স্থান শুধু একজনেরই—এবং যেহেতু কোথাও পৌঁছবারও নেই—তাই কোন প্রতিযোগিতাও নেই। ফলে জীবন আবার উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। নিৎসে-ও ঈশ্বরের জায়গায় মানুষকে বসিয়েছিলেন—কিন্তু তাঁর নাস্তিবাদ জীবনকে উদ্দেশ্যহীন করেনি, জীবনের উদ্দেশ্য তিনি আরোপ করেছেন will to power। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, object in itself সম্পর্কে জ্ঞান অনর্থক—তার ওপর প্রভুত্ব অর্জন করাই প্রধান কথা, সুতরাং will to power। সার্ত্র-এর চিন্তা প্রায় কাছাকাছিই বলা যায়, তবে তিনি বললেন, will to action। এই অসীম শূন্যতায় মানুষের জীবন একটা বুদবুদের মতন—মানুষ তার জীবনকে মূল্য দিতে পারে যদি এই শূন্যতার মধ্য দিয়েও মানুষ তার নিজস্ব চিন্তাকে কাজের রূপ দিতে পারে।

সার্ত্র—তাঁর এই নব্য দর্শনকে এক বাস্তব রূপক দিয়ে বোঝাবার চমৎকার সুযোগ পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ ফরাসি দেশের বাস্তব রূপক। 'দি রিপাবলিক অফ সাইলেন্স' গ্রন্থে সার্ত্র বলেছেন, ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মান অবরোধের সময়ই ফরাসিদের চৈতন্য সব সময় স্বাধীন ছিল। কথাটা একটু চতুরবিপরীত উক্তির মতন শোনালেও এর রূপক অর্থ সত্যিই মর্মভেদী। সেই সময় ফরাসিরা সব রকম অধিকার হারিয়েছে, কথা বলার অধিকার থেকে শুরু করে সব কিছু। প্রত্যেকদিন তারা অপমানিত হচ্ছে এবং তা সয়ে যেতে হচ্ছে নিঃশব্দে। যে-কোন ছুতোয় দলে দলে লোককে পাঠানো হচ্ছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। প্রত্যেক জায়গায় খবরের কাগজে, বিজ্ঞাপনে, চলচ্চিত্রে ফরাসি দেশের এমন ছবি দেখানো হচ্ছে—যা প্রত্যেক ফরাসির কাছে ঘৃণ্য কিন্তু জার্মানরা যা বিশ্বাস করাতে চায়। এইজন্যই সে সময়ে ফরাসি চৈতন্য সবচেয়ে স্বাধীন; কারণ তখন প্রত্যেক ফরাসিই মনে মনে সব কিছুর বিরুদ্ধে 'না' বলতে পারছে।

নির্বাসন, নির্যাতন, বন্দীত্ব কিংবা মৃত্যু প্রাত্যহিক ঘটনা, কিন্তু প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে এগুলো নিয়তির মতন অপ্রতিরোধ্য কিংবা অসংবরণীয় বিপদ নয় তবুও এগুলো ঘটবেই। এই কয়েকটি বছর ধরে অসংখ্য ফরাসি দিবারাত্রি শুধু বলছে—'না' 'না'। এবং এই নাস্তিকতার মধ্যেও জীবনের একটা মূল্য পাবার জন্য সে একটা নিজস্ব পথ খুঁজছে। সেই পথই প্রতিরোধ আন্দোলন, অথবা বলা যায়—দার্শনিক সার্ত্র যে ফরাসি প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তার একটা সমর্থনযোগ্য ব্যাখ্যা এর মধ্যেই পাওয়া যায়।

সার্ত্রের তত্ত্ব নতুন ধর্মমত না হলেও এক ধরনের নতুন মানবতাবাদ। এই নতুন মানবতাবাদের মধ্যেও ফাঁক আছে। ফরাসি দেশে জার্মান অবরোধ বাস্তব ঘটনা হলেও আমি একে রূপক বলেছি তার কারণ ফরাসি দেশের অন্যান্য দেশে এই অবরোধে রূপান্তর এত বেশি যে তাদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বলা যায় আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই রূপক যথেষ্ট ধোঁয়াটে। এখানেও আমরা না না বলে এগুতে চাই—কিন্তু নাস্তি আমাদের শুধু নৈরাশ্যই এনে দিচ্ছে—সামনে ঈশ্বর নেই, পথে সমভ্রাতৃত্ব কিংবা will to action সম্পর্কে চৈতন্যের বিশ্বাস তেমন জোরাল নয়। নাৎসি অবরোধের সময় নাৎসিরা ফরাসিদের কাছে যে জীবনের ছবি দেখাতে চাইত—তা অসংখ্য ফরাসিদের কাছে মনে হত ঘৃণ্য। আমরা কারো দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে নেই এবং আমাদের সমাজ বা রাষ্ট্র বা শিক্ষালয়ের শিরোমণিরা যে জীবনের ছবি দেখাতে চান তাকে চলতি অর্থে গৌরবজনকই বলা যায়। কিন্তু কল্যাণ, শুভবোধ, শান্তি, মৈত্রী—এসমস্ত কথাগুলোই সার্বিক নাস্তিবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কেন এত দুর্বল এবং জোলো শূন্যগর্ভ শোনায়—তা কেউ ভেবে দেখিনি। খানিকটা এলোমেলো ধরনে এই রকম কথাই জীবনানন্দ দাশ একটি কবিতায় লিখেছিলেন।

'আলো অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালবাসা নয়
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে
সব কাজ তুচ্ছ মনে হয়—পাণ্ডু মনে হয়
সব চিন্তা—প্রার্থনায় সকল সময়
শূন্য মনে হয়
শূন্য মনে হয়।'

পুরো কবিতাটি পড়লে বোঝা যায়, সব কিছুর প্রতি প্রশ্ন ও অস্বীকার করে করে মানুষের স্বাধীন চৈতন্য যে অসীম শূন্যতায় এসে দাঁড়ায়—তিনিও সেখানেই এসে অসহায় হয়ে পড়েছেন। বিভ্রান্ত হয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন,

'সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুখ দেখে
আমি একা হয়েছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?'

'আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?' এই প্রশ্ন তোলার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায় প্রশ্নকারীর মূল উদ্দেশ্য এ কথাই জানানো যে এই ধাঁধার জগতে তিনি একা নন।

বস্তুর পেরিয়ে মানুষের চৈতন্য এখন সেই চরম স্বাধীনতার স্তরে এসে পৌঁছেছে—যখন সবকিছুকেই সে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। ফরাসি দেশে অবরোধের সময়ই যেমন ফরাসী চৈতন্য সবচেয়ে স্বাধীন ছিল—আমাদের এই বর্তমান সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জগতেও তেমনি স্বাধীনতা। কিন্তু এই অস্বীকার ও নাস্তির জগৎ বড় শীতল নির্মম, বড় কষ্টকর। এ সংসারে মানুষ সমস্ত দারিদ্র এড়াবার চেষ্টা করলেও—নিজের কাছে দারিদ্র এড়াতে পারে না—সে দারিদ্র হচ্ছে জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া। শুধু উদ্দেশ্য নয়, জীবনের একটা সত্য, মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার যে ভিত্তি—যার নাম মনুষ্যত্ব, তার একটা উৎস। এটা খুঁজে না পেলে সে ছটফট করে।

আবু সয়ীদ আয়ুব বলেছেন তিনিও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না—কিন্তু জীবনের একটা সামগ্রিক পূর্ণতায় তিনি বিশ্বাসী—ধ্বংস বা ঘৃণার বদলে কল্যাণের পথই সেই পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু এই পূর্ণতার ধারণাও ঈশ্বর বিশ্বাসের মতনই একটা বিশ্বাস। সমস্ত প্রশ্ন বন্ধ রেখে এক রকমের সমর্পণ। স্বাধীন চৈতন্য একে স্বীকার করে নিতে পারবে না সহজে। বস্তুত আমাদের দেশে এখন চেষ্টা প্রয়োজন—তা এই ধরনের কোন বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন বারবার একঘেয়ে ভাবে তুলে ধরা নয়ই! প্রয়োজন এই অবিশ্বাস ও নাস্তির জগতে জীবনের একটা যুক্তিসিদ্ধ উদ্দেশ্য খুঁজে বার করা। সেই উদ্দেশ্য খুঁজে না পেলে জীবনটা যদি নিছক অর্থহীন মনে হয়—তখনি এই জীবনটাকে নিজহাতে ধ্বংস করার ইচ্ছে জাগাও খুব অসম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসগুলি অস্বীকার করার পর তাদের আবেদন সত্যিই নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে মানুষের ভিত্তিমূল সরে গেছে, মানুষের কোন আশ্রয় কোন ভবিষ্যৎ নেই, এক সর্বগ্রাসী শূন্যতা শুধু চৈতন্য জুড়ে আছে। এখন দুটো পথ খোলা—এই শূন্যতার কাছেই আত্মসমর্পণ—যার একদিকের রূপ, জড়ত্ব ও নির্বেদ, অপরটি আত্মধ্বংসী শক্তিকে বাধা না দেওয়া—অন্যদিকে জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে নিয়ে এই শূন্যতা থেকে বেরিয়ে আসা। আমরা এখন আছি এই সন্ধিক্ষণে, আমাদের মধ্যে এখন দ্বিধা—আমরা কোন্ পথ বেছে নেব। বলাই বাহুল্য, জড়ত্ব কিংবা আত্মধ্বংসই সহজ বলে সেদিকেই অনেকের ঝোঁক ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে—কিন্তু অন্যদিকেও অনুসন্ধান বন্ধ হয়নি—এটা আশা করাই সংগত।

□

ভ্রমণ

নদীপথে সুন্দরবন

নদীর নাম হাতানিয়া-দোয়ানিয়া। কোন নদীর এমন অদ্ভুত নাম আমি আর শুনিনি। কী এর মানে? কোন উদ্দাম কল্পনায় এরকম নাম দেওয়া যায়? অথচ নামটা বেশ সুন্দর, বেশ ঘরোয়া, খুব আপন আপন। সুন্দরবন এলাকায় অনেক নদীর নামই খুব মধুর। যেমন ঠাকুরান, যেমন মৃদঙ্গভাঙা। তবু হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নামটিই আমার বেশি পছন্দ। এর সমতুল্য নামের আর একটা নদী আমি পেয়েছিলাম, সেটি আসামে, তার নাম ঝাটিংগা।

হাতানিয়া-দোয়ানিয়া ছোট নদী হলেও বেশ তেজী। কলকাতা থেকে মাত্র সত্তর-আশি মাইল দূরে সমুদ্র থাকলেও আমরা যে সরাসরি বাসে চেপে বা গাড়িতে সমুদ্রের কাছে পৌঁছে যেতে পারি না, তার কারণ এই নদীটি শুয়ে আছে নামখানার পাশে। এর ওপর একটা সেতু বানানো যায় না? যায় নিশ্চয়ই, তবে যেমন তেমন সেতু বানালে চলবে না, সেটি বানাতে হবে বেশ উঁচু করে কারণ এই নদী দিয়ে অনেক বড় বড় মাছবাহী নৌকো যায়, স্থানীয় বাণিজ্যের জন্য যেগুলি খুব জরুরী। তবু সেরকম একটা সেতুও কি বানানো যায় না? যাবে না কেন, কিন্তু কে-ই বা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

হাতানিয়া-দোয়ানিয়ার বুকে একটা ছোট্ট ছিমছাম সপ্রতিভ লঞ্চে চড়ে যাত্রা শুরু হল। বিকেলের পাতলা রোদকে চাদরের মতন উড়িয়ে সুপবন বইছে। আমরা কয়েক বন্ধু লঞ্চের ওপরের ছোট ক্যাবিনে জমিয়ে বসলাম। খানিকটা দূর যেতেই নদীর দু'ধার গৃহ-বিরল হয়ে এল, ধু-ধু করা মাঠ, মাঝে মাঝে এক-একটা একলা গাছ। নদীর ধারে এখানে সেখানে প্রতীক্ষমান এক পায়ে-খাড়া-হয়ে থাকা বক। পরিচিত দৃশ্য।

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এসে পড়লাম একটা বড় নদীতে। এ নদীর নাম সপ্তমুখী। নদী তো নয়, গোলোকধাঁধা। সাতনরী হারের মতন নদীটি ছড়িয়ে আছে, এর কোন্ মুখ যে কোথায় গিয়ে পড়েছে, একবার-দুবার যাতায়াতে তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য।

এবার আর নদীর দু'ধার রুক্ষ নয়, ঘন গাছের দেওয়াল। আমরা ঢুকে পড়েছি সুন্দরবনে। বুকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা, চোখ দুটি যেন সব কিছু হাঁ করে গিলতে চায়। এর আগে অসম, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশের অনেক জঙ্গলে ঘুরেছি, এমন কি জঙ্গল দেখতে গেছি সুদূর আন্দামানেও, কিন্তু ঘরের কাছেই সুন্দরবন, পৃথিবীর বিখ্যাত অরণ্যগুলির একটি তা-ই আমার দেখা হয়নি এতদিন। এক একটা ব্যাপার ঠিক যেন হয়ে ওঠে না। যেমন, আমি শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাস-খানা পড়িনি। শরৎচন্দ্রের অন্য সব বই একাধিকবার পড়া, অথচ এই বইখানা হাতের কাছে পাইনি বা যে-কারণেই হোক, পড়া হয়ে ওঠেনি। লোকে যখন 'গৃহদাহ' নিয়ে আলোচনা করে, চুপ করে থাকি। তেমনি সুন্দরবন সম্পর্কেও।

আমরা যে-দিকটায় যাচ্ছি, সেদিকটা সুন্দরবনের আসল ভয়াবহ দিক নয়। ক্যানিং থেকে গোসাবা হয়ে ঢোকা যায় নিবিড় সুন্দরবনে, সেখানকার চামটা ব্লক ইত্যাদি রোমহর্ষক জায়গা। সেদিকে এখন যাওয়া হয়নি, একদিন যাব নিশ্চয়ই। এখন আমরা যেদিকে চলছি, সেদিকেও ধনচে ব্লকে বাঘ আছে। তাই নামখানায় টাইগার প্রজেক্টের বোর্ড ঝোলে।

ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউগুলো ধাক্কা মারে তীরের নরম মাটিতে। মাঝে মাঝে ঝুপ ঝুপ করে পাড় ভেঙে পড়ে। সেইদিকে তাকিয়ে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। এক একজনের এক একরকম অনুষঙ্গ। আমার ছেলেবেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নদী-নালা-খাল-বিল। জলের দেশে বাল্য ও কৈশোরের কিছু বছর কাটিয়েছি। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে খেলা করতে যাবার সময় মাঝখানের খানিকটা জায়গা সাঁতরে পার হয়ে যেতে হত। একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি নৌকোয়, ছোট খাল, দু'পাশে কুঁকে পড়েছে গাছপালা, স্বচ্ছ জলের মধ্যে দেখা খলসে আর চাঁদা মাছ। (খলসে মাছ কি পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে? বহুকাল দেখিনি।) ফরিদপুরে আমাদের গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিল এক দুর্ধর্ষ নদী, নাম আড়িয়েল খাঁ—পাড় ভাঙার জন্য বিখ্যাত। কতদিন সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছি ঝুপঝাপ করে পাড় ভেঙে জলে পড়ে যাচ্ছে। তখন নদীর কূল ভাঙার সঙ্গে জীবন বা সংসারের কোন উপমা মনে আসত না, এমনিই দেখতে দেখতে শিহরন জাগত।

—ঐ যে একটা কুমীর।

ডেক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। কুমীর দেখার জন্য আমরা হুড়মুড় করে বাইরে এলাম। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চৌধুরী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ও আমি। এছাড়া সেচ ও শিক্ষা, বিভাগের কয়েকজন অফিসার, আমরা যাঁদের অতিথি। কিন্তু আমরা ঠকে গেলাম, চিৎকারকারী আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিলেন। কুমীর টুমির কিছু নয়, চরের ওপর পড়ে আছে একখণ্ড পোড়া কাঠ। কুমীর এরকমভাবে শুয়ে থাকে বটে কিন্তু আমাদের খুশি করার জন্য সেদিন কোন কুমীর একবারও চরের ওপর রোদ পোহাতে এল না। আমরা ক্যাবিনের জানলা দিয়ে এমন ব্যগ্রভাবে তাকিয়েছিলাম যেন যেকোন মুহূর্তেই একপাল হরিণ কিংবা একটা জ্যান্ত বাঘ দেখে ফেলব। কিন্তু একটা জনপ্রাণী চোখে পড়ে না। শুধু একটানা বোবা জঙ্গল।

প্রথম দর্শনে সুন্দরবনকে একটু সুন্দর লাগে না। মনে মনে আমি এই অরণ্যের অন্য একটি চিত্র এঁকে রেখেছিলাম। বস্তুত, আগেকার দেখা অন্য কোন বনের সঙ্গেই সুন্দরবন মেলে না। অন্য সমস্ত নিবিড় বনে দেখেছি বিশাল বিশাল বনস্পতি, শাল, সেগুন, জারুলের গগনচুম্বী স্পর্ধা। কিন্তু সুন্দরবনের গাছগুলো ছোট ছোট, একতলা দেড়তলা বাড়ির চেয়ে বেশি উঁচু নয়। ভেড়ার লোমের মতন অত্যন্ত ঘনভাবে জড়ামড়ি করে আছে গাছগুলো। দেখলেই বোঝা যায়, তারা জেদী ও শক্তিশালী, তাদের মোটামোটা শেকড় লম্বা হয়ে মাটির ওপর দিয়ে এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। জোয়ারের সময় নদী অনেকটা ঢুকে যায় বনের মধ্যে, আবার জল নেমে আসার পর জমে থাকে থকথকে কাদা, সেই কাদা ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে থাকে অজস্র শূল। এবং সেই কাদার ওপরে কানকো দিয়ে হাঁটা চলা করে এক রকমের মাছ। মেঘ ডাকলে কই মাছকে অনেক সময় ডাঙার ওপর দিয়ে চলতে দেখেছি—এছাড়া যখন তখন স্থলে ভ্রামামাণ এই একটাই মাছ আমার চোখে পড়েছে চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন জায়গায়, যে মাছের সঠিক বলা নাম কেউ জানে না, এক একজন এক একরকম বলে। নোনা জল ঢুকলে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, আর সেই নোনা জল খেয়েই সুন্দরবনের গাছপালা এত তেজী ও স্বাস্থ্যবান। শুনেছি সুন্দর ওরফে সুঁদরি গাছের জন্যই সুন্দরবন নাম। সে গাছ একটাও দেখলাম না। শোনা গেল, পূর্ববাংলা ওরফে বাংলাদেশের দিকে কিছু আছে। এ পাশে আর চোখে পড়ে না। আর এক রকম গাছ খুব বেশি, যার স্থানীয় নাম বাইন। আর সব গাছের নাম জানি না।

নদীর ধারের দিকের গাছগুলি অধিকাংশই হিন্তাল বা হেঁতাল, এরকম শুনলাম। আবার অবাক হবার পালা। মনসামঙ্গল কাব্যে পড়েছিলাম, চাঁদ সদাগরের হাতে সব সময় একটা হিন্তালের লাঠি থাকত। আগে জানতাম না হিন্তাল গাছ কী রকম, কিন্তু চাঁদ সদাগরের লাঠি নিশ্চয়ই একটা বেশ শক্তপোক্ত জিনিস হবে। কিন্তু এ গাছগুলো তো বেঁটে ঝোপের মতন।

অনেকটা বেত ও খেজুর গাছের সংমিশ্রণ বলে মনে হয়। পাতাগুলো সবুজ হলদেটে মেশানো, পরে অবশ্য কাছ থেকে দেখেছি, হিন্তালের ঝোপেই লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে, বানানোও যায়। হেঁতালের ঝোপগুলো দেখে মনে পড়ছিল মানগ্রোভের কথা, যা প্রচুর দেখেছি দাঁড়িয়ে মানগ্রোভগুলোর ডাকাতের মতন স্বাস্থ্য।

খানিক বাদেই অন্ধকার হয়ে এল। এখন দু'পাশে শুধু নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একটাও সার্চলাইট একটা আলোর পথ তৈরি করে রেখেছে, তাতে মাঝে মাঝে দেখা যায়, দু'একটা মাছ ধরার নৌকোর টিমটিমে আলো। দূরে এক জায়গায় দেখা যায়, জলের বুকে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। না আলেয়া নয়, কাছে গেলে দেখা যায়, একটা বড় স্টিমার বা থেমে সাত আট দিনে পৌঁছোয়। এখানকার ডাঙায় যেমন বাঘ-কুমীর, তেমনি জলে বড় ডাকাতের উপদ্রব।

ওয়ালস ক্রীক, কারজন ক্রীক, চালতাবুনিয়া, জগদ্দল—এইসব অদ্ভুত নামের খাঁড়ি-নদীর পাশে পাশে পাথরপ্রতিমা, শিবগঞ্জ, কিশোরী নগর—এ ধরনের নামের গ্রাম। এরই মধ্যে একটি ভাগবতপুর। এখানে আছে কুমীরের চাষ। আমরা ভাগবতপুরে দিনের আলো থাকতে নামতে গিয়ে একজন পড়ল কাদার মধ্যে, আমি ভাঙা ঝিনুকে পা কেটে ফেললাম। ভাগবতপুর—এরকম জমকালো নাম সত্ত্বেও ঘরবাড়ি কটিন চোখে পড়ে। এখানে নারকোল চাষের সরকারি পরিকল্পনায় খুব ধুমধাম করে নারকোলের চারা লাগানো হয়েছিল কয়েক হাজার। তার অধিকাংশই গুয়োরে খেয়ে গেছে কিংবা লোকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কুমীর প্রকল্পটি অবশ্য সদ্য তৈরি হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশে এখন আর কুমীর নেই, তাই ভারত সেই সব দেশে কুমীর বিক্রি করে বিদেশি মুদ্রা আনবে। বাঘ-সিংহ-কুমীর জাতীয় প্রাণীরা স্মরণাতীত কাল থেকে এই সেদিন পর্যন্ত ছিল মানুষের শত্রু, মানুষ ওদের হাতে মরেছে কিংবা ওদের মেরেছে। এখন সেই মানুষ যত্ন করে ওদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এখন বাঘ যদি মানুষই মারে, তার কোন শাস্তি হবে না, কিন্তু মানুষ যদি বাঘ মারে তার জেল হবে নির্ঘাৎ। মানুষ বড় মজার জাত।

সুন্দরবনের নানা জায়গা থেকে ধরে আনা হচ্ছে কুমীর, কিংবা খুঁজে আনা হচ্ছে কুমীরের ডিম। তারপর জলের উত্তাপ মেপে, তাদের রুচিমতন খাদ্য দিয়ে অনেক তরিবৎ করে লালন করা হচ্ছে তাদের। পটাসিয়াম পারামাঙ্গানেট মেশানো জলে পা ধুয়ে আমরা ঢুকলাম একটা হলঘরের মতন খাঁচাঘরে কুমীরের বাচ্চা দেখতে। চল্লিশ-বেয়াল্লিশটা বাচ্চা কুমীরকে ডিম ফুটিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন চৌবাচ্চায়। এক একটা গিরগিটির চেয়ে একটু বড়, কাছে গেলেই ধারাল দাঁত মেলে হাঁ করে আসে। একবার ধরতে পারলে খুবলে মাংস তুলে নেবে। আমরা মুখ দিয়ে উৎকট শব্দ করে ওদের ভয় দেখাই। একসঙ্গে এতগুলো কুমীরের বাচ্চা। জীবনে আরও কত কিছু দেখব। সন্ধে হবার আগেই লঞ্চে ফিরে এলাম।

আমাদের গন্তব্য সীতারামপুর। সেখানে সেচ বিভাগের একটা ছোট বাংলো আছে। এর পর আর জনবসতি নেই বললেই চলে। অদূরে সমুদ্র। আমরা কয়েক বন্ধু রাত্রে লঞ্চেই থেকে গেলাম হইহই করে জেগে, আধো-ঘুমিয়ে। ওপারের ঘনচে জঙ্গলের বাঘরা আমাদের সেই কোলাহলে বিরক্ত হয়েছিল কিনা কে জানে।

সকালবেলা সাগরের মোহনা পর্যন্ত যাবার চেষ্টা করেও ফিরে আসতে হল। জোয়ারের

জল ঢুকছে তার মধ্যে আমাদের লঞ্চটা মোচার খোলার মতন টাল-মাটাল। সারেং চটপট লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে ফেলল।

ফেরার পথ ওপারের জঙ্গল ঘেঁষে। পারমিট ছাড়া এই জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ। আমাদের কাছে সেসব কিছুই নেই। ঠাসা, জমজমাট অত্যন্ত বনা ধরনের বন, এর ভেতরে হাঁটতে গেলে দু'হাতে বন ঠেলে ঠেলে যেতে হবে। তবু একবার যেতে ইচ্ছে করে। চরের ওপর বসে আছে একঝাঁক খয়েরি রঙের বুনো হাঁস, হাওয়ায় গাছের ডগাগুলো দুলে দুলে উঠছে, জোয়ারের জল বেড়ে উঠছে লকলক করে। এ সময় কোন ভয়ের চিন্তা মনে আসে না। ইচ্ছে হয় এক ছুটে জঙ্গলটা একবার ঘুরে আসি।

সারেংকে বললাম, একবার লঞ্চটা থামান না। এখানে তো দেখবার কেউ নেই। আমরা একটুখানি ঘুরেই চলে আসব।

সারেং কিছুতেই রাজি নয়। মানুষটি বেশ সদালাপী, এর আগে আমাদের অনেক উপদ্রব সহ্য করেছেন। কিন্তু এবার বললেন, না বাবু, আপনারা জানেন না সুন্দরবনকে বিশ্বাস নেই। কখন কোথা থেকে যে বিপদ ঘটে যায়, কিছুই বলা যায় না। এই তো সেদিন একজনকে... পারে নামা মাত্তরই বাঘ এসে ...

এর পর তিনি আমাদের একটি রোমহর্ষক কাহিনী শোনান। সুন্দরবনের বাঘের এরকম অত্যাচারের কাহিনী আমরা আগেও পড়েছি বা শুনেছি। এই টাটকা কাহিনীটি যে সত্য তার প্রমাণ হিসেবে, সারেং বললেন, আহত ব্যক্তিটিকে এখন মুমূর্ষু অবস্থায় কাকদ্বীপের হাসপাতালে দেখা যেতে পারে। অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবু আমরা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে রইলাম।

একটু পরে দেখি যে একটা খুব সরু খাঁড়ি দিয়ে একটা ছিপ নৌকোয় দু'তিনজন লোক ঢুকছে ঐ জঙ্গলে। আমরা বললাম, ঐ যে লোকগুলো যাচ্ছে ওদের ভয় নেই?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সারেং বিচিত্রভাবে হেসে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তখনই বুঝলাম আমাদের মূর্খামি। যারা প্রতিদিন না খেতে পেয়ে মরে যাবার দুশ্চিন্তা নিয়ে বেঁচে আছে, তাদের কি বাঘের ভয় পেলে চলে? এ আর নতুন কথা কী?

জীবন্ত মরুভূমি

'কাল সকালে মরুভূমি দেখতে যাবে?' ভাবছিলাম কার সঙ্গে যাব। অরিজোনায় এসে ক্যাকটাসের মরুভূমি না দেখার কোন মানে হয় না। ভুবনবিখ্যাত এই মরুভূমি, এমন আর দেখা যায় না কোথাও। এ মরুভূমি শুধু বালুকাময় নয়, অথচ গাড়ি ছাড়া যাবার উপায় নেই। এমন সময়ে কানের কাছে দৈববাণীর মত ড্রুমন্ডের প্রশ্ন।

ড্রুমন্ড হাডলি একজন তরুণ কবি, আমার চেয়ে বছর দু'একের ছোট হবে হয়ত (আমি এই জুলাই-এ উনত্রিশ)। পাঁচ বছর আগে বিয়ের পর ড্রুমন্ড হানিমুন করতে গিয়েছিল কম্বোডিয়া ও ভারতবর্ষে। রথের মেলার সময় পুরীতে গিয়েছিল আসল সমুদ্র নয়, জনসমুদ্র দেখতে।

'তবে এমন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলাম যে, ভ্রমণের অর্ধেক আনন্দই মাটি হয়ে গিয়েছিল'—ও বলল। বললাম, 'দাখো, আমাদের সরকারি হিসেবে ম্যালেরিয়া ভারতবর্ষ থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে, ওটা বোধ হয়—'

—কম্বোডিয়া থেকে হয়েছিল, আমারও তাই মনে হয়।

—ভাগ্যিস তুমি বললে, তোমরা বললে দোষ নেই। আমি বললেই অন্য দেশের নিন্দে হয়ে যেত। একেই তো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব নেই বললেই চলে।

বাড়িতে বাঘ পুষেছে ড্রুমন্ড। সত্যিকারের বাঘের বাচ্চা, মরুভূমি থেকে ধরা। ওর স্ত্রী, ভারি লক্ষ্মী, শ্রীময়ী মেয়েটি, পরীক্ষার জন্য খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করছিল, আমি যেতেই শিষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল, পাশ থেকে ঘর্-র্র্-র্ করে উঠল বাঘের বাচ্চা। 'ভয় পেয়ো না, আমাদের বেড়ালটা কারুকে কিছু বলে না।'

চারটে কাবুলি বেড়াল সাইজের ঐ আট মাসের বাঘের বাচ্চাটা—দেখেই আমার হাড় হিম। একটা বড় ঘরে আলাদা করে রেখেছে ওটাকে—ওরা দু'জনে বেড়ালের মতই ওটার সঙ্গে খেলা করে। ব্যাপারটা গোপন, পুলিসে জানতে পারলে ধরে নিয়ে যাবে। আমি এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে সেই গল্পটা বললাম, সেই যে কোন এক ভদ্রলোক বাঘ পুষেছিলেন, তারপর বাঘ সেই লোকটার হাঁটু চাটতে চাটতে হঠাৎ রক্তের স্বাদ পেয়ে খাঁক করে কামড়ে দেয়। ওরা দু'জন হেসে বলল, একজন লোক ফেইল করেছে বলে আমরা পারব না, তার কি মানে আছে। মানুষ অ্যাটমকে পোষ মানাচ্ছে—বাঘ তো দূরের কথা। তুমি কাছে এসে ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখ না, কিছু বলবে না।'

আমি বললাম, 'না ভাই থাক, দূর থেকেই দেখছি। এমনিতেই আমার শরীরে আঠার ঘা আছে'। সকাল নটা আন্দাজ ড্রুমন্ডের ভ্যান নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। অ্যারিজোনার টুসন্ শহরে একেবারে গা থেকেই মরুভূমি আরম্ভ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়—তার ওপাশের মেক্সিকোর সীমানা।

—মরুভূমি সম্বন্ধে যা ভাবছ তা নয়, ড্রুমন্ড বলল, 'অন্যরকম, দেখ, তোমার ভাল লাগবে।

কিন্তু একটা কথা, মরুভূমি দেখে কবিত্ব করা চলবে না। বিশেষত এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড আবৃত্তি করা একেবারেই নিষেধ। আমি অনেক শুনেছি।'

—'সুন্দর দৃশ্য দেখলে আমার মনে মোটেই কবিত্ব জাগে না। আমার খিদে পায়।'

—'কি?'

—'মাইরি বলছি, আমার খিদে পায়। অর্থাৎ আমার হৃদয়ে কাজ করে না, তার একটু নিচে, পেটে প্রতিক্রিয়া হয় আমার।

ও হেসে বলল, 'ভয় নেই, আমার বউ কয়েকটা হ্যামবার্গার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।'

বিষম জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমি দু'পাশের দৃশ্য দেখার বদলে ড্রুমন্ডকে দেখছিলাম। একটা ব্লু জিন আর গেঞ্জি পরেছে, মাথার চুল এলোমেলো। সুঠাম স্বাস্থ্য ও সাহস, বাড়িতে পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও বাগান, বাঘ পুষেছে—এই একজন আমেরিকার তরুণ কবি। ভারি চমৎকার খোলামেলা ছেলে ড্রুমন্ড, কিন্তু একটা দোষ : যখন খুব উৎসাহে কথা বলে, তখন খাঁটি ওয়েস্টার্ন অ্যাকসেন্ট বেরিয়ে পড়ে—আমার পক্ষে বোঝা দুষ্কর হয়। ও বলল, 'এখানে খুব জলের অভাব'। তারপরই গড়গড় করে কি শুরু করল—আমি কিস্যু বুঝতে পারলাম না, তবুও সেনটেন্সের মধ্যে কমা, ফুলস্টপ বসাবার মত মাঝে মাঝে হুঁ হ্যাঁ, 'ও তাই নাকি' করে যেতে লাগলাম। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কি কর?' আমি একেবারে গভীর জলে পড়লাম। যদিও বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা জল সম্বন্ধেই। এস্টিমেশন, ড্রিলিং এই সব শব্দ শুনেছি বটে। আমতা আমতা করে বললাম,

'আমি ঠিক—'

—'ঠিক কোন জায়গা খুঁড়লে জল পাওয়া যাবে কি করে বুঝতে পারো?'

বললাম, 'আমি ঠিক ও বিষয়ে কিছু জানি না। আমি জন্মেছি পূর্ববঙ্গে, সেখানে জল থাকাটাই একটা সমস্যা, না-থাকা নয়। রাজস্থানের দিকে ও সমস্যা আছে বটে—কিন্তু ওরা কি করে আমি জানি না।' একটু থেমে আবার বললাম, 'একটা কথা বলব? তোমাদের দেশের অনেক কবির সঙ্গে কথা বলে দেখেছি—তারা কবিতা ছাড়াও আরও অনেক বিষয় জানে। স্পেসশিপের কোথায় কোথায় শূন্য স্টেশন হওয়া দরকার, হায়ারোগ্লিফিক্সের পাঠান্তর, নদীর তলায় সুড়ঙ্গ বানাবার কি কি সমস্যা, বাঁদরের মস্তিষ্ক টেস্ট টিউবে আলাদা বাঁচিয়ে রাখার পর সেই অশরীরী মস্তিষ্কের দুঃখ ও আনন্দ বোধ থাকে কি না, ইন্দোনেশিয়ার প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা—এই সব। আমাদের দেশের কবিরা একটু ন্যালাখ্যাপা টাইপ, জেনারেল নলেজে শূন্য, ধুতি পাঞ্জাবীতে জেবড়ে থাকে, এক চেয়ারে বসলে ঘন্টা পাঁচেকের কমে উঠতে চায় না, কবিতা ছাড়া আর কোন বিষয়েই কিছু জানে না—হয়তো সেই জন্যই তোমাদের চেয়ে ভাল কবিতা লেখে।'

আমার শেষ কথা শুনে ও চমকে আমার দিকে তাকাল। তারপরেই ঝকঝক করে হেসে উঠল। বলল, 'কি জানি, হয়তো সত্যি। আমি বেশি পড়িনি—বিশেষ করে তোমাদের ঐ হরিবল্ ট্রানস্লেশনে টেগোরের লেখাও আমার মোটেই ভাল লাগেনি। কিন্তু তোমাদের একটা অসুবিধে আছে—যেটা আমাদের নেই। তোমাদের কাঁধের উপর চেপে আছে তোমাদের ঐতিহ্য, তোমাদের ধর্ম তোমরা নির্জন হতে পার না। কিন্তু আমাদের ওসব ঝামেলা নেই—আমরা সবাই গভীর অন্ধকারের মধ্যে হাঁটছি, সুতরাং আমাদের প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে খুঁজতে হচ্ছে—আমরা নির্জন আধুনিক মানুষ—সকলেই।'

—'কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি তোমাদেরও লোভ কম নয়। তোমরা—'

—দ্যাখ, দ্যাখ, ঐদিকে দ্যাখ।

আকাশে একটা বড় সাইজের পাখি দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কি?'

—গোল্ডেন ঈগল্!

বিশাল ডানাওয়ালা সোনালী ঈগল এই অঞ্চলে এ[illegible] দেখতে পাওয়া [illegible] শুনেছিলাম,

আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু 'গোল্ডেন ঈগল' এ নামটা খুব চেনা, কলকাতায় বহু গ্রীষ্মের দুপুরবেলা ও নামে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে।

তাড়াতাড়ি একটা জোরাল দূরবীন বার করে ড্রুমন্ড ছুটল ঐ পাখিটার পিছনে গাড়ি নিয়ে। এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ী রাস্তায় কি দুঃসাহসিক গাড়ি চালানো—এক হাতে স্টিয়ারিং, এক হাতে দূরবীন নিয়ে বাইরে ঝুঁকে—চোখ রাস্তায় নয়, আকাশে। কিন্তু অমন দুঃসাহসীর পাশে বসেছিলাম বলে আমারও ভয় করল না। কি ভয়ংকর গতি ঐ ঈগলের—ঘুরতে ঘুরতে প্রায় মহাশূন্যে বিন্দুর মত হয়ে গেল হঠাৎ আবার ঝুপ করে নেমে এল খুব নীচে—শোঁ-শোঁ করে আবার পেরিয়ে গেল পাহাড়ের পর পাহাড়, মিলিয়ে গেল দিগন্তে কয়েক মিনিটে। আমরা গাড়ি নিয়েও ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলাম না।

ড্রুমন্ড বলল, 'ঐ ঈগল আমেরিকার প্রতীক চিহ্ন।'

গাড়ি উঠে এসেছিল একটা ছোট পাহাড়ের মাথায়। ডানদিকে তাকিয়ে বিশাল মরুভূমি চোখে পড়ল। সত্যিই, আমাদের কল্পনায় যে মরুভূমির ছবি আছে—অর্থাৎ মাইলের পর মাইল হলুদ বালি, গনগনে হাওয়া—এ মরুভূমি সে রকম নয়। এ মরুভূমি জীবন্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সারা ভূমি জুড়ে অসংখ্য সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলো ক্যাকটাস, পশ্চিম অঞ্চলের বিখ্যাত ক্যাকটাস, সরল, দীর্ঘ প্রত্যেকটা অন্তত দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো। প্রথম শাখা বেরোয় পঁচাত্তর বছরে—ঐ শাখা বা ডানা গুনে বয়েস বোঝা যায়। ওগুলোকে বলে সাউয়ারো (স্প্যানিশ নাম : Saguaro জি উচ্চারণ হয় না)—গ্রীষ্মকালে ফুল ফুটতে থাকে—বীভৎসতার বদলে এ মরুভূমিকে মনোরমই দেখায়। মরুভূমি নয়, পুরোটাই যেন এক মরূদ্যান। এ ছাড়া আছে অন্য নানা জাতের ক্যাকটাস, প্রিক্‌লি পিয়ার—বুনো শেয়াল, কাঁকড়া বিছে, ছোট বাঘ, র‍্যাটেল স্নেক (ল্যাজে যে গুলোর খটখট আওয়াজ হয়), হরিণ। জল নেই, ফসল হয় না—কিন্তু মরুভূমির বদলে পোড়ো জমি কথাটাই মনে আসে কিন্তু ড্রুমন্ড আগেই এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ডের উল্লেখ করতে বারণ করেছে।

এই মরুভূমির দৃশ্য আমাদের অদেখা নয়। আমেরিকার যাবতীয় ওয়েস্টার্ন ছবিতে দেখেছি, ঘোড়া ছুটছে কাউবয়রা, কথায় কথায় গোলাগুলি খুনোখুনি—এখানকার রেড ইন্ডিয়ানের প্রায় সবাইকে মেরে ফেলে এখন মিউজিয়মে পুরেছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে। এখানে রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে, তারপর স্প্যানিশদের সঙ্গে, তারপর সিভিল ওয়ারে। মরুভূমি মাত্রই রক্ত লোভী, আরবের মরুভূমিও কম রক্ত শোষেনি। ড্রুমন্ড জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

বললাম, 'ভাই ড্রুমন্ড, যদি সত্য কথা বলতে হয়—এ সব-দৃশ্যই আমি আগে ছবিতে দেখেছি। এ দেখার চেয়ে, ছবিতে বেশি সুন্দর লেগেছিল।'

—'যাঃ, তা হয় নাকি?'

—'তোমাকে ঠিক যুক্তি দেখাতে পারব না। এ জায়গাটা বড় বেশি বিশাল আমার পক্ষে, আমি ছোট করে, ফ্রেমের মধ্যে না দেখতে পেলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না।'

—দুঃখের বিষয়, আমি ক্যামেরা আনিনি। 'আরেকদিন পাহাড়ের ওদিকে গুহা দেখতে যাব, তখন।' (পরে একদিন অসিত রায় ও সুবোধ সেনের সঙ্গে গিয়েছিলাম।)

ছেলেমানুষের মত ড্রুমন্ড বলল, 'জানো এখানে হরিণ আছে? হয়ত এই মুহূর্তে দশটা হরিণ দশ দিক থেকে আমাদের দেখছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

আমাদের মোটামুটি গন্তব্য ছিল ডেজার্ট মিউজিয়ম—মরুভূমির ঠিক মধ্যে আসল পরিবেশে মরুভূমিতে যা কিছু পাওয়া যায়—তার প্রদর্শনী। ড্রুমন্ড জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিছু মনে করবে, যদি আমরা একটু ঘুরে যাই? ঐ ডানদিকের টিলাটা আমার দেখা হয়নি।'

আমি বললাম, 'না-না আমার কোন আপত্তি নেই। তবে ওটা দেখা হয়নি মানে? তুমি কি মরুভূমির সব জায়গা জানো নাকি?'

—'প্রায়, আমি প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে আসি, এবং নানান জায়গা দেখি।'

—'কেন?'

প্রথমে ও কারণটা বলতে চাইল না। লাজুক হেসে আমতা আমতা করতে লাগল। মুগ্ধ হবার জন্য মরুভূমিতে প্রতি সপ্তাহে আসার মত এরকম খেলো কবিত্ব ও করবে বলে আমার বিশ্বাস হল না। পরে কারণটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ড্রুমন্ড মরুভূমিতে সোনা খুঁজতে আসে। এই খোঁজা নতুন নয়। সোনার লোভেই সাদা চামড়ার লোকেরা আসে পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত, তারপর একদিন দেখতে পায় প্রশান্ত মহাসাগর। সোনার লোভে কত হত্যাকাণ্ড হয়েছে নিজেদের মধ্যে। ভুলে গেছে মানুষের জীবন সোনার চেয়েও দামী। এতকাল সোনার লোভে একপাল লোক মরেছে—সাদা হাড় ও কঙ্কালের স্তূপের মধ্যে ঝিক্‌ঝিক্ করেছে দু'একটা সোনার দাঁত। কিন্তু এখন সোনার লোভে কেউ আসে জানতাম না, শেষে কি একটা পাগলের পাল্লায় পড়লাম! কিন্তু ড্রুমন্ডের অমন সরল সুন্দর মুখে কোন স্বর্ণলোভ দেখলাম না। সোনা নয়, সোনা খুঁজছে —এইটাই যেন বড় ব্যাপার। র্যাঁবোর কবিতার মত : যখন আমি ফিরব, আমি সোনা নিয়ে আসব।

—'তোমার সত্যিই ধারণা এখানে সোনা পাওয়া যায়?'

—'নিশ্চয়ই! কত লোক ছুটির দিনে আসে সোনা তৈরি করতে। কিন্তু তারা সারাদিনে যতটুকু সোনা পায় বালি ছেঁকে—তাতে দিনের মজুরি পোষায় না। আমি খুঁজছি এমন একটা জায়গা—যেখানে অফুরন্ত সোনা। নিশ্চয়ই কোথাও আছে।'

পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়ি চলল পাহাড়ী পথে। ড্রুমন্ডর গাড়িটাও ওরই মত ডাকাবুকো। কড়্‌কড়্, মড়্‌মড়্ শব্দ হতে লাগল, ডানদিকে বাঁদিকে বিষম হেলে পড়তে লাগল, তবু চলল ঠিকই। শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় থামল। আর রাস্তা নেই। আমরা নেমে হাঁটতে লাগলাম। 'সাবধানে হেঁটো সুনীল, র্যাটেল্ স্নেক আছে খুব! অবশ্য ভয় নেই—কামড়ালে মানুষ চট্ করে মরে না।' খুব একটা ভরসা পেলাম না যদিও ও কথা শুনে।

একটা ছোট টিলা পেরতেই দূরে একটা বাড়ি চোখে পড়ল।

—'এখানে এই বিশ্রী মরুভূমিতে কে বাড়ি করেছে?'

—'জানি না, আমি আগে দেখিনি। তবে ভেব না কোন সাধু-সন্ন্যাসী, তোমাদের ইন্ডিয়ার মত—নিশ্চয়ই কেউ সোনার লোভে এসেছে!' বাড়ির সীমানায় বহুদূর থেকে কাঁটা-তারের বেড়া। কোথাও কারুর কোন সাড়াশব্দ নেই। আমরা দরজা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। হলিউডের সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মত—আমি প্রতি মুহূর্তে বন্দুকের গুলি আশা করছিলাম। কাছে এসে অবাক হয়ে গেলাম। বাড়িটা নতুন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত! যেন কোন ছাদ নেই, দেওয়ালে বড় বড় ফুটো (বন্দুকের গুলির কিনা কে জানে!)—আসবাবপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করা। প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে কেউ ভেঙেছে নতুন রেফ্রিজারেটর—কিন্তু হাতুড়ি মেরে ভাঙা হয়েছে বোঝা যায়, গ্যাসস্টোভের শুধু পাইপগুলো ভেঙে দখল করা হয়েছে—নতুন কাঠের চেয়ার অথচ ভাঙা, সোফা কুশন ছুরি দিয়ে ফাঁসানো।

আমি ড্রুমন্ডের মুখের দিকে তাকালাম। ও বলল কি জানি, হয়ত ঝড়ে ভেঙেছে—মাঝে মাঝে এখানে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। এখানে বাড়ি বানানোই বোকামি!'

আমি বললাম, 'না, ঝড় অসম্ভব। মানুষের কাজ।'

—'হতে পারে, একজন গ্যাংস্টার এসে লুটপাট করেছে। কেউ হয়ত এখানে ছুটি কাটাবার জন্য বাড়ি বানিয়েছিল। হয়ত কেউ থাকত না এখানে!'

ডায়নামো বসিয়ে ইলেকট্রিক কানেক্‌শন পর্যন্ত ছিল, তারগুলো দেয়াল থেকে ছেঁড়া, মেশিনটা তোবড়ানো। দেয়ালে কুৎসিত ছবি—তাই দেখে প্রাক্তন বাসিন্দাদের রুচির খানিকটা

পরিচয় পাওয়া যায়। সবই ন্যাংটো মেয়েমানুষ, কয়েকটা খড়ি দিয়ে আঁকা, একটি স্ত্রীলোকের শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্ল্যাং ভাষায় নাম লেখা, যেন কারুকে শেখানো হয়েছে।

—'ওওরা এ সব জিনিসপত্র ভেঙেছে কেন—নিয়ে যেতে তো পারত?'

—'মরুভূমিতে এসব জিনিসের লোভে কে আসে, সবাই আসে সোনার লোভে।' ড্রুমন্ড বিষম উৎসাহ পেয়ে গেল ব্যাপারটাতে—শখের গোয়েন্দার মত খুঁটিনাটি দেখতে লাগল। এক-একটা জিনিস পায়—আর আমাকে ডেকে ডেকে দেখায়—আধপোড়া পিয়ানো, এক বাক্স ছেঁড়া-জামা কাপড় এই সব। মরুভূমি দেখতে এসে কি এক রহস্যময় বাড়িতে এসে হাজির হলাম। হঠাৎ খানিকটা দূর থেকে ড্রুমন্ড আমাকে ডাকল। কাছে গিয়ে দেখলাম, ড্রুমন্ড মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসেছে। ওর সামনে একটা ছোট্ট কবর। একটা কাঠের ক্রুশে ছোট্ট একটা পতাকা—তাতে লেখা, 'এই ভয়ঙ্কর মরুভূমি আমাদের সাধের খোকনকে খুন করেছে। শ্রীমান ফ্রেডেরিক, (বয়স আট) ঈশ্বর তোমাকে আশ্রয় দেবেন।' তারিখ খুব টাটকা, মাত্র একুশ দিন আগের। ড্রুমন্ড গম্ভীরভাবে বলল, 'চলো, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। এখানে কোন রহস্য আছে—শেষে আমরা পুলিশ কেসে জড়িয়ে পড়ব।'

ঐ রহস্যময় বাড়ি পেরিয়ে পাহাড়ের ঢাল্ বেয়ে আমরা অন্যদিকে নেমে গেলাম। বিশাল ক্যাক্‌টাসগুলো একটু আগেও যেন নিজেদের মধ্যে কি সব সব বলাবলি করছিল, আমাদের দেখে থেমে গেল। বিষম গরমে কান ঝাঁঝাঁ করছে। একটা নদীর খাতের মত জায়গা দেখলাম, মাঝে মাঝে বাঁধানো ঘাটের মত, একবিন্দু জল নেই। প্রাগৈতিহাসিক কালে হয়ত সেখানে নদী ছিল।

আমিই প্রথম সোনা আবিষ্কার করলাম। আমি আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম, মাঝে মাঝে বসছিলাম ক্যাকটাসের ছায়ায়, কাঁটা বাঁচিয়ে—ড্রুমন্ড ষষ্টীপুজোয় মানতকরা মেয়েমানুষদের মত মাঝে মাঝেই শুয়ে পড়ছিল মাটিতে—কোথাও গন্ধ শুঁকছে, কোথাও মাটিতে কানপেতে কি শুনছে এবং মাঝে মাঝে ওর সেই ইমোশনাল ইংরেজীতে (দুর্বোধ্য) কি সব বলছে। এমন সময় আমি বেশ একটা গোল, নধর, পাউডার পাফ (ফরাসীরা বলে শাশুড়ীর মাথা) ক্যাকটাসের তলায় দিব্যি একতাল সোনা দেখতে পেলাম। ঠিক একটা ছোটখাট ফুটবলের সাইজ, রোদের আলো পড়ে ঝলসে দিচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল—ড্রুমন্ড নিশ্চয়ই আমাকে আর্ধেক শেয়ার দেবে, তা হলে, ওটার দাম কত কে জানে—দেশে ফিরে অন্তত বছর পাঁচেক আমাকে কোন চাকরি করতে হবে না! সোনা, আমি সোনা পেয়েছি! আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'ড্রুমন্ড ঐ দেখো!'

বিষম চমকে ও মুখ ফেরালে তারপর আমার আঙুল সোজা লক্ষ্য করে সোনার তালটা দেখতে পেয়ে ও তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'ওঃ তাই বল! তুমি এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলে—আমি ভাবলাম সাপ না বাঘ! আমি আবার বন্দুকটা আনিনি!'

—'ও কি তবে?'

—'সোনা!'

কাছে গিয়ে ড্রুমন্ড ওই জিনিসটাকে এক লাথি মেরে বলল, 'বাস্টার্ড।' সেই সোনার তালটা অমনি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল ঝুরঝুরে বালির মতন। অথচ ঠিক সোনার তালের মতনই দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, 'একি!' ও বলল, 'এই জিনিসগুলো কম ঝামেলা করে? এর নাম কি জান,—বোকার সোনা, ফুল্'স গোল্ড। যা কিছু চক্‌চক্ করে তাই সোনা নয়। বছর দশেক আগেও এ জিনিস আবিষ্কার করে কত লোক নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেছে।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আবার সেই সরল হাসি হেসে বলল, 'ভাগ্যিস তুমি ওটা দেখতে পাবার পরই পেছন থেকে আমাকে ছুরি মারোনি!'

বস্তুত, ব্যাপারটা এমন মেলোড্রামাটিক হল যে তারপর থেকে আমার বিষম বিশ্রী লাগতে

লাগল। আর মরুভূমি দেখার সম্পূর্ণ ইচ্ছে চলে গেল আমার। ওটা দেখতে পারার পরমুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে যে দুমদুম্ শব্দ হওয়া শুরু করেছিল—তা আর থামল না। বিষম ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ডুমন্ডকে স্বর্ণ-লোভী ভেবে মনে মনে একটু ক্ষীণ অবজ্ঞা করতে শুরু করেছিলাম—কিন্তু তখন, তারপর থেকে কোথা থেকে এক গভীর নিরাশা আমার বুক ভরে দিলে। যেন কেউ সেই মুহূর্তে কেড়ে নিল আমার পাঁচ বছর চাকরি না করার ছুটি, যেন পাঁচ বছর চাকরি করার পরিশ্রম একসঙ্গে সেই মুহূর্তে আমার কাঁধে চেপে বসল।

আমরা ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। ডুমন্ডের বউএর বানিয়ে দেওয়া হ্যামবার্গার আর স্যান্ডউইচ খেলাম। গাড়ির পিছন দিকটা খুলে ডুমন্ড কি যেন খেতে লাগল চোঁ-চোঁ শব্দে—মনে হল যেন পেট্রল খাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলাম এখানে আলাদা একটা জলের ট্যাঙ্ক আছে। ঘন ঘন মরুভূমিতে আসার জন্য পাকা ব্যবস্থা। 'ডানদিকে ঐ অঞ্চলটা একটু দেখেই আমরা যাব মিউজিয়ামে। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?'

—'না, আমি এখানে বসছি। তুমি ঘুরে এস।'

—'আমার ঘণ্টাখানেক লাগবে।

একটু দূরে যাবার পর আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'ডুমন্ড, সাবধানে ঘুরো। হারিয়ে যেও না। —কিংবা, মরে যেও না। কারণ, আমি পথও চিনি না, গাড়িও চালাতে জানি না।'

একটু পরেই ডুমন্ড মিলিয়ে গেল দূরে। আমি একা গাড়ির ছায়ায় বসলাম। চারিদিকে এমন নিঃশব্দ যে ভয় করতে লাগল। হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, একটা শুকনো পাতারও শব্দ নেই। দূরে সেই পোড়ো বাড়ি। আমি ওটার থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে বসলাম। দু'মানুষ-তিনমানুষ লম্বা ক্যাকটাসের সারি চলে গেছে মাইলের পর মাইল—সান্টা ক্যাটালিনা পাহাড় পর্যন্ত। নিস্তব্ধতা যেন জীবন্ত হয়ে ঘুরছে সেই মরুভূমিতে। আমার হাতঘড়ি নেই, সময় জানি না। একমাত্র শব্দ শুনছি নিজের হৃৎপিণ্ডের। তখনও প্রবলভাবে দুমদুম্ করছে।

একটু শব্দ হলেই এদিক-ওদিক তাকাই। মনে হয় বুঝি কোন র‍্যাটল স্নেক তাড়া করে আসছে। র‍্যাটল স্নেক আগে দেখেছি আমি, লেজের দিকটা শুকনো হাড়, কট্ কট্ কট্ কট্ আওয়াজ হয়। দেখলেই কেমন ঘেন্না লাগে। লম্বা লম্বা ক্যাকটাসগুলো যেন এক দৃষ্টে দেখছে আমাকে। ডুমন্ড কোথায় গেল? দু'বার ডুমন্ড বলে চেঁচিয়ে ডাকলাম। কোন সাড়া নেই। ডুমণ্ড যদি আর না ফেরে? মরুভূমির মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে থাকার মতন একাকিত্ব বুঝি আর হয় না।

ক্রমশ দুর্বলতা বোধ এসে দিচ্ছে। মরুভূমিতে এতকাল যে সব অসংখ্য মানুষ মরেছে—তাদের সবার জন্য অসম্ভব দুঃখ বোধ করতে লাগলাম। উপরের দিকে তাকানো যায় না, আকাশ এত গরম। অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত মনে হতে লাগল অসম্ভব লম্বা। এর থেকে ঘুমিয়ে পড়া ভাল আমার মনে হল। গাড়ির মধ্যে ঢুকে লম্বা সিটে শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে আমি একটা জলে ডোবা মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলাম সেদিন।

বাঘের দেশে বাঘের গল্প

আমি হাসতে হাসতে বললাম। যদি বলি, আমার বুকে বাঘের পায়ের ছাপ আছে, কেউ বিশ্বাস করবেন?

সত্যিই কেউ বিশ্বাস করল না, সবাই এমন ভাবে চক্ষু অবনত করল যেন এই নিস্তব্ধ, নির্মীল সন্ধ্যায় আমি কোন অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। এখানে এসব কথা মানায় না।

আমি আবার বললাম, সত্যিই বলছি কিন্তু, ইয়ার্কি নয়। একবার একটা বাঘ দু'পা তুলে দাঁড়িয়েছিল আমার বুকে।

এবার শ্রোতারা চক্ষু তুলল। চোদ্দ-পনের বয়স্ক কিশোর মাস্কিটি জিজ্ঞেস করল, সার্কেসের বাঘ, বাবু?

কথা হচ্ছিল সুন্দরবন অঞ্চলে এক বিশাল চওড়া নদী বক্ষে একটি খোলা নৌকোর ওপর। বেরিয়েছিলাম সারাদিনের মত, এই নৌকোর ওপরেই বিচুড়ি ভোগ হল, রান্না করলাম নিজেরাই। আর এমন খিচুড়ি জীবনে খাইনি, কী অমৃতের মতন স্বাদ!

আমার সঙ্গে আমার এক কলকাতার বন্ধু, তার এক স্থানীয় বন্ধু, একজন স্কুল শিক্ষক। আর বাকি এই তিনজনেরই সুন্দরবনের সঙ্গে সংযোগ দীর্ঘদিনের, এই অঞ্চলের অনেক কিছুর খবরাখবর রাখেন। মাঝিদের মধ্যে একজনের বয়েস তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোন জায়গায়, রোদ-বৃষ্টিতে পোড়া-ভেজা লোহার মতন গড়া-পেটা শরীর, মুখে অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ। আর একজন ঐ পূর্বোক্ত কিশোর।

সুন্দরবনে এলেই বাঘের কথা মনে পড়ে। এর আগে কয়েকবার লঞ্চে চড়ে সুন্দরবন ঘুরে গেছি, কিন্তু সে শুধু প্রকৃতি দেখা। এবারে এসে আশ্রয় নিয়েছি একটি গ্রামে। যার পাশের গ্রামেই একটি ছটকে আসা বাঘ ধরা পড়েছে কিছুদিন আগে। সে বাঘটিকে রাখা হয়েছে কলকাতার চিড়িয়াখানায়, তার নাম দয়ারাম। আমি এখানে এসে পৌঁছবার পরের দিনই নদী সাঁতারে মোল্লাখালিতে এসে উঠেছিল একটা বাঘিনী, গ্রামের লোকজন সেটাকে ঘিরে রেখেছেন, ভেবেছিলাম সেটাকে দেখতে যাব, বিকেলেই খবর পেলাম ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নীতির তোয়াক্কা না করে সেটিকে মেরে ফেলেছে। সুন্দরবনে ভগবানের চেয়েও বাঘের কথাই বেশি স্থান পায় আলাপচারিতে। এবারে নৌকোয় বেরিয়ে বুঝলাম, লঞ্চ-ভ্রমণের সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। নৌকোয় বসে নদীকে অনেক কাছে পাওয়া যায়, দু'পাশে জঙ্গলকে আমরাই শুধু দেখি না, জঙ্গলও আমাদের দেখে।

বাঘ সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের শহুরে কৌতূহল আছে। সেইজন্য আমি বারবার সবাইকে জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনারা কেউ বাঘ দেখেননি? নিজের চোখে?

আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার নৌকোর সহযাত্রীরা সবাই নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়ল। এরা সবাই সুন্দরবনের নাড়ি-নক্ষত্র জানে, এতদিন এখানে রয়েছে, অথচ কখন বাঘ দেখেনি! আমি বাঘ সম্পর্কে রোমাঞ্চকর একাধিক গল্প শুনব আশা করেছিলাম। বেশ নিরাশ নিরাশ লাগল। তখন আমি শুরু করলাম এক লোমহর্ষক কাহিনী।

কিশোর মাক্কিটির প্রশ্ন শুনে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, ধর যদি সার্কাসের বাঘই হয়। একটা সার্কাসের বাঘ যদি তোমার বুকে পা তুলে দাঁড়ায়, তুমি ভয় পাবে না?

ছেলেটি হে হে করে হাসতে লাগল।

ইস্কুল মাস্টার এবার জিজ্ঞেস করলেন আপনি সত্যিই সার্কাসের বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছিলেন নাকি?

আমি বললাম, না। বাঘের থেকেও আমি শত হস্ত দূরেই থাকাই ভাল মনে করব। পাকেচক্রে একবার আমি সত্যিই একটা মস্ত বড় কেঁদো বাঘের খপ্পরে পড়েছিলাম। ব্যাপারটা হয়েছিল ওড়িশার যোশীপুরে—।

আমার কলকাতার বন্ধুটি যার নাম শিবাজী, সঙ্গে সঙ্গে বলল, ও, বৈরি?

নৌকোর অন্যান্য সুন্দরবনবাসী সঙ্গীরা কেউ বৈরির নাম শোনেনি। এদিকের লোকের সঙ্গে ববরের কাগজের বিশেষ সম্পর্ক নেই। বড়-মাক্কি জিজ্ঞেস করল, বৈরি কি দাদা?

রায়মঙ্গল নদী ছাড়িয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি সমুদ্রের দিকে। ডান দিকে দত্ত ফরেস্ট, সেখানে বাঘ নেই খুব সম্ভবত। বাঁ দিকের জঙ্গলটা বাঘের এলাকা বলে নির্দিষ্ট, আমরা চলেছি সেই ধার ঘেঁষেই। একটা জায়গায় নদীর জল খানিকটা খাঁড়ির মতন ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে, সেখানটার নাম কালীর চর সেখানে হাজার হাজার হাঁস এসে বসে। আমাদের গন্তব্য সেইদিকেই। সেখানে বাঘের উপদ্রবের ভয় আছে, আমরা কেউ শিকারী নই। সঙ্গে অস্ত্রও নেই, দূর থেকে পাখিগুলি দেখে আসাই উদ্দেশ্য।

এই পরিবেশে আমি জমিয়ে বাঘের গল্প শুরু করলাম।

অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে সুখকর ছিল না মোটেই, খানিকটা হাস্যকর হলেও হতে পারে। সেবারে যাবার কথা ছিল সিমলিপাল জঙ্গলে।

কলকাতা থেকে ট্রেনে ঝাড়গ্রাম, সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে বারিপদা, সেখান থেকে আবার একটা গাড়ি কোন ক্রমে জোগাড় করে যোশীপুর। অবশ্য সিমলিপাল যাবার জন্য এত ঘুরপথে যাবার কোন দরকার হয় না, কিন্তু আমাদের ভ্রমণটাই উল্টোপাল্টা। যোশীপুরে রাতটা কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলা আমরা জিপ নিয়ে ঢুকব জঙ্গলে, সেই অনুযায়ী যোশীপুর বাংলো বুক করা ছিল। কিন্তু তখন খৈরির কথা মনেই পড়েনি।

যোশীপুর বাংলোর কম্পাউন্ড মস্ত বড়, মনে হয় যেন বাংলোর পেছন থেকেই জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। ঘরগুলোর সামনে বেশ বড একটি ঢাকা বারান্দা। লোহার গেট খুলে ভেতরে ঢোকার পরই দেখলাম, কালো ডোরাকাটা কী যেন! সত্যিই একটা বাঘ! আমরা এসে গেলে বারান্দাটায় বসতে না বসতেই বাঘটা চলে এল সেখানে। ডি এফ ও শ্রীযুক্ত চৌধুরীও সেখানে বসে কনকর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, সংক্ষেপে আমাদের জানালেন, ভয় পাবেন না। ও কিছু করে না।

বাঘটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসে গন্ধ শুঁকতে লাগল। আমাদের মধ্যে কারুকে তার পছন্দ হবে কি হবে না, কে জানে! আমি বড় সাইজের কুকুরও সহ্য করতে পারি না। কারুর বাড়িতে অ্যালসেশিয়ান কুকুর থাকলে সে বাড়িতে পারত পক্ষে যাই না। আমি লক্ষ্য করেছি, যাদের অ্যালসেশিয়ান থাকে, তারাও ঠিক ঐ ভাবেই বলে, "ভয় পাবেন না! ও কিছু করে না!" কিছু করে না মানে কি, কাছে এসে গন্ধ শুঁকবেই বা কেন?

একটু বাদে বাঘটা আবার বাগানে চলে গেল। আমরা চলে এলাম আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে। জামা কাপড় ছাড়ব কিনা ভাবছি, হঠাৎ শুনি জানালার কাছে মৃদু গর্জন। এবং বাঘের মুখ। বাঘটা জানলা দিয়ে আমাদের একটু ক্ষণ দেখল, তারপরই ঢুকে এল আমাদের ঘরে। তার আগেই আমরা দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু একজন মহিলা (পরে জেনেছি, তাঁর নাম নীহার চৌধুরী) বলে উঠলেন, দরজা বন্ধ করবেন না! ও বন্ধ-দরজা দেখলে রেগে যায়।

একটা বাঘকে খুশি করার জন্য আমাদের দরজা খোলা রাখতে হবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাঘ এসে ঘোরাঘুরি করবে, এটাই বা কেমন কথা। সারা ঘরে বাঘ-বাঘ গন্ধ। আমরা নিনা বাক্যব্যয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি। আবার এসে বসলাম বারান্দায়। যোশীপুরে এই বাঘটি সাধারণ বনের বাঘের চেয়েও আয়তনে অনেক বড়। একে রোজ আট কেজি মাংস ও একটিন আমূল গুঁড়ো দুধ খাওয়ানো হয়। বনের বাঘ রোজ এত খাবার পাবে কোথায়? এর পেটে চর্বি থল থল করছে। বারান্দায় বসে শ্রীমতী চৌধুরী তাঁর পালিতা কন্যা এই খৈরি বিষয়ে নানান কাহিনী শোনাতে লাগলেন। আমরা গল্প শুনছি বটে, কিন্তু আমাদের সকলের চোখ লক্ষ্য রাখছে বাঘটা কত দূরে। আমাদের পাঁচজন বন্ধুর দলের মধ্যে রয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সে ঐ খৈরি বিষয়ে ইতিমধ্যেই একটি ছোটদের বই লিখে ফেলেছে। সুতরাং তার ভয় পেলে চলে না। শ্রীমতী চৌধুরীর সঙ্গেও তার আগে থেকে চেনা, সুতরাং ঐ সব গল্প সেই উপভোগ করতে লাগল বেশি।

এরপর শুরু হল বাঘের ভোজন পর্ব। বাগানে এক জায়গায় ধপাস্ করে শুয়ে পড়ল খৈরি, আর মা যেমন নিজের শিশুর মুখে খাদ্য তুলে দেয়, সেই ভাবে শ্রীমতী চৌধুরী ওর মুখে মাংস পুরে দিতে লাগলেন। কিন্তু বাঘ একজায়গায় বেশিক্ষণ বসে খায় না। এক এক গ্রাস মুখে দিয়েই সে উঠে পড়ছে, চলে যাচ্ছে বাগানের দিকে, অনেক সাধ্য সাধনা করে ডেকে আনা হচ্ছে তাকে।

একসময় বাঘটা হঠাৎ উঠে এল বারান্দায়, এবং নিমাই নামে আমাদের এক বন্ধুর বাঁ হাতের কনুই শুদ্ধ অনেকখানি মুখে ভরে দিল। এবার একটু চাপ দিলেই নিমাইয়ের বাঁ হাতখানা চিরতরে বাঘের পেটে চলে যাবে। বাঘটার হঠাৎ এরকম অদ্ভুত মতিগতির কারণ কি? ওর কি মোষের মাংস পছন্দ হয়নি বলে ও টাটকা মাংসের সন্ধানে এসেছে? ডি এফ ও শ্রীযুক্ত চৌধুরী যথারীতি বললেন, ভয় পাবে না, ও কামড়াবে না!

ভয়ে মানুষের চুল খাড়া যাবার কথা শুধু বইতেই পড়েছিলাম, এবার স্বচক্ষে দেখলাম। নিমাইয়ের মাথার সবকটা চুল সত্যিই খাড়া হয়ে গেছে, কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, ওকে সরিয়ে নিন্, নইলে আমরা অজ্ঞান হবে যাব! ভয়ের চোটে নিমাই আমির বদলে আমরা বলে ফেলেছে। আমরা সশঙ্ক চিত্তে অথচ খানিকটা হাসতে হাসতেও দেখতে লাগলাম ওকে। এই হাসির শক্তি আমি পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই!

বাঘটা নিমাইকে ছেড়ে এদিক ওদিক চেয়ে গজরাতে লাগল। বাঘের ডাকের সঙ্গে মানুষের জন্ম জন্মান্তরের ভয়ের সম্পর্ক। পোষা বাঘ হোক আর যাই হোক, এরকম ডাক শুনলে বুক আপনিই কেঁপে ওঠে।

বাঘটা এবার চলে এল সোজা আমার দিকে। তারপর সে আমার ডান দিকের বগলের মধ্যে ঢুঁ মারতে লাগল। যেন সে আমার বগলের মধ্যে অতবড় মাথাটা ঢুকিয়ে দিতে চায়। আমি অসহায়-ভাবে তাকালুম শ্রীমতী নীহার চৌধুরীর দিকে। তিনি স্নেহের হাসি দিয়ে বললেন, ও কিছু না। ও ঘামের গন্ধ শুঁকতে ভালবাসে। তখন ঘাম মানে কী। আমার সারা শরীর দিয়ে কুলকুল করে ঘামের নদী বইছে!

বাঘটা আর একবার ঢুঁ মারতেই আমি অটোমেটিক্যালি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও দাঁড়িয়ে দুটো থাবা রাখল আমার বুকে। সেই কয়েকটি মুহূর্ত আমি জীবনে কখন ভুলব না। আমার শরীরের ওপরে একটা বিরাট কেঁদো বাঘ, আমার চোখের সামনে ওর জ্বলন্ত চোখ, সেই অবস্থায় বাঘটা ফ-র্-র্-র্ করে থুতু ছোটাল, সেই থুতুতে ভিজে গেল আমার মুখ ও জামা। ওরই মধ্যে আমি ভাবলাম, বাঘটা যদি আমায় না-ও কামড়ায়, আমি যদি বাঘটাকে শুদ্ধ মাটিতে পড়ে যাই, তাহলে ওর অতবড় দেহের ভারেই আমি ছাতু হয়ে যাব। শ্রীমতী চৌধুরী বারবার বলতে লাগলেন, ভয় পাবেন না, নড়বেন না, ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিন। কিন্তু হাত

তোলার সাধ্য আমার নেই, আমার সারা শরীর অসাড়। আমারও মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল কিনা তা তো আমি নিজের চোখে দেখিনি, তবে ঐ অবস্থায় আর একটুক্ষণ থাকলে আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যেতুম!

ইতিমধ্যে 'খৈরি, আমার খৈরি' গ্রন্থের প্রণেতা শক্তি আমার পাশ থেকে সুট্ করে উঠে গিয়ে সোজা চলে গেছে গেটের দিকে। নিমাই বাংলোর বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি সারারাত এই মাঠে শুয়ে থাকব, তবু ওর মধ্যে আর যাব না। আমাদের দলনেতা পার্থসারথি চৌধুরী বলল, নাঃ, ঐ বাঘের সঙ্গে রাত্রিবাস করা মোটেই কাজের কথা নয়। চল, এক্ষুনি জঙ্গলে চলে যাই। তাই হল, আমরা রওনা দিলাম সেই দণ্ডেই!

গল্প বলা শেষ করে আমি আমার বুকে হাত বুলিয়ে বললাম, এই যে ঠিক এই জায়গায় বাঘটা তার থাবা রেখেছিল।

শ্রোতারা সবাই চুপ। একটু পরে বড় মাঝিটি শুধু খানিকটা বিস্ময় খানিকটা বিরক্তি মিশিয়ে বলল, শখ করে কেউ বাঘ পোষে? ঘুঃ! ওটাকে মেরে ফেলে না কেন?

আমি বললাম, মারবে কী? ঐ বাঘটা খুব বিখ্যাত, সারা পৃথিবীর অনেক পত্র-পত্রিকায় ওর ছবি ছাপা হয়েছে।

বড় মাঝি আবার নদীর জলে থুতু ফেলল। টাইগার প্রজেক্টের জন্য সুন্দরবনে বহু টাকা খরচ করে কত রকম বন্দোবস্ত হচ্ছে, কিন্তু সুন্দরবন এলাকার যতজনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তারা সকলেই বাঘকে শত্রু বলে মনে করে, এবং তাদের মতে বাঘ নামক প্রাণী জাতিটাকে বাঁচিয়ে রাখবার কোন প্রয়োজন নেই।

আস্তে আস্তে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। কালীর চরের বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। বাড়ির মধ্যে অনেক হাঁসের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি বটে, কিন্তু আলো কমে আসায় আর ঠিক মতন দেখা যাচ্ছে না। আমি আর একটু ভেতরে যাবার কথা বললাম, কিন্তু মাঝি বা অন্য কেউ রাজি হল না। একটু পরেই ভাঁটা শুরু হলে ফেরা মুশকিল হবে। তা ছাড়া জায়গাটা ভাল নয়। এই বনে বাঘ আছে তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভয় ডাকাতের।

আমি বললাম, আমাদের কাছে তো টাকা-পয়সা কিছু নেই, ডাকাত আমাদের কী করবে? মাস্টারমশাই বললেন, এখানকার ডাকাতদের ব্যাপার আপনারা জানেন না। কিছু না পেলে ওরা জামাকাপড় খুলে নেয়। আপনি যে প্যান্ট-শার্ট পরে আছেন, তার দামও তো কিছু না হোক সত্তর-আশি টাকা। আর এই নৌকাটা, এরও তো দাম আছে। জামা-প্যান্ট খুলে নিয়ে ওরা লোককে এই জঙ্গলের পাশে নামিয়ে দিয়ে যায়।.

আমি পাশের জঙ্গলের দিকে তাকালাম। দিনের বেলা দেখতে চমৎকার লাগছিল। এখন অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সেই জঙ্গলের দিকে তাকাতেই গা ছম্ ছম্ করছে। নগ্ন অবস্থায় রাত্রিবেলা এই জঙ্গলের পাশে পড়ে থাকা মোটেই উপাদেয় চিন্তা নয়।

সকলেরই মত হল, তা হলে এবার ফেরা যাক। কিন্তু খুব নির্বিঘ্নে ফেরা গেল না। একটুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল ভাঁটার টান, এখন উল্টো দিকে যাওয়া যাবে না। আমাদের নৌকো একটা চরে আটকে গেল। জোয়ার আসবে ঘণ্টা দেড়েক বাদে।

আমাদের নৌকোটা অবশ্য জঙ্গলের খুব কাছে নয়। কোন বাঘ হঠাৎ এক লাফে নৌকোর ওপর পড়তে পারবে না, সাঁতরে আসতে হবে। এই নদীর জলেও খুব কামঠের উপদ্রব, এবং কুমীর প্রকল্পের উদ্যোগে কিছুদিন আগেই এই নদীতে চল্লিশটি কুমীরের বাচ্চা ছাড়া হয়েছে।

চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। জঙ্গলের দিকে তাকালেই মনে হয়, একটা বাঘ বুঝি আমাদের একদৃষ্টে দেখছে। খুবই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এ জঙ্গলে জোনাকিও জ্বলে না। কিন্তু বাঘের চেয়ে ডাকাতের কথাই আমার মনে পড়তে লাগল বেশি। বড় মাঝিকে

আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এতদিন সুন্দরবনের নদীতে নৌকো চালাচ্ছেন, সত্যিই কখন বাঘ দেখেননি?

বড় মাঝি বললেন, না।

তারপর যেন একটু ধমকের সুরেই আমায় আবার বলল, বাবু একটু চুপ করেন তো। অথবা এই সময়টা আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন বরং।

আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলাম। এই ভর সন্ধেতে হঠাৎ আমি ঘুমোতে যাব কেন? তবে নৌকার অন্য আরোহীদের মধ্যে যেন একটা ঝিমুনির ভাব এসে গেছে। কেউ কোন কথা বলছে না। অগত্যা আমিও চুপ করে গেলুম।

এক সময় নৌকোর তলায় জলের কলকল শব্দেই টের পাওয়া গেল জোয়ার এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন এক সঙ্গে জেগে উঠল। নৌকো চলল আবার। রাত সাড়ে দশটায় আমরা ফিরে এলাম আমাদের গ্রামের কাছে।

জেটিতে নৌকো বেঁধে ওপরে উঠে আসার পর বড় মাঝি বলল, দাদা, আপনি বাঘের কথা জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন না? এই দ্যাখেন। চর্চা মেরে দ্যাখেন।

এই বলে সে জামাটা তুলে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল। টর্চের আলোয় দেখলাম, তার পিঠে গভীর ক্ষত। খুব বেশি পুরনোও মনে হল না।

মাস্টার মশাই বললেন, ওর কী কড়া জান্, বাঘে কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরও বেঁচে উঠেছে।

বড়মাঝি দম্ভ করে বলল, আমারে খাবে, এমন বাপের ব্যাটা বাঘ আজও জন্মায়নি, বোঝলেন!

মাস্টারমশাই বলল, ও বাঘের গুনিন। সবাই ভাবে, সেই জন্যই বাঘে ধরার পরও বেঁচে উঠেছে।

ওদের মুখ থেকে আরও শুনলাম, এই মাঝি তার এই নৌকো নিয়ে প্রায়ই জঙ্গলে যায় বে-আইনি কাঠ কাটতে। সুন্দরবনের অনেকেরই জীবিকার সঙ্গে কাঠ জড়িত। একবার নয়, মোট পাঁচ বার, ঐ মাঝি দলবল নিয়ে বাঘের সামনে পড়েছে, তবু আবার যায়। ডাকাতের পাল্লায়ও পড়েছে অনেক বার। অন্য বন্ধুটি বলল, দীনেশ নামে একটি ছেলে তার বাড়িতে কাজ করত, মাত্র মাসখানেক আগে সে এই রকম একটি কাঠ কাটার দলের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে আর ফেরেনি।

এদের সকলেরই বাঘ বা ডাকাত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু নৌকোর ওপর বসে আমি যখন এদের কাছ থেকে দু'একটা ঘটনা শুনতে চাইছিলাম, তখন সবাই চুপ করে ছিল কেন? মাস্টারমশাই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, জঙ্গলের কাছে বাঘের এলাকার মধ্যে গিয়ে বাঘের গল্প করা তো দূরের কথা, কেউ বাঘের নামও উচ্চারণ করে না। ঐ প্রসঙ্গ তুলে আমিই ভুল করেছিলাম।

সত্যিই আমার ভুল হয়েছিল।

ফ্লোরেন্স কেন ভাল লাগল না

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর ফ্লোরেন্স। আমার ভাল লাগেনি। ফ্লোরেন্সের শিল্প-সামগ্রীর তুলনা নেই, দেখে দেখে আশ মেটে না, লাখ লাখ মানুষ সেখানে ছুটে যায় প্রতি বছর, তবু আমার ভাল লাগেনি।

চেনাজানা যারাই ফ্লোরেন্সে গেছে, প্রত্যেকেরই চোখেমুখে মুগ্ধতা, শুধু আমি মুগ্ধ হতে পারিনি। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল কেন?

নিজেকেই সেই প্রশ্ন করি। ব্যক্তিগত কোনও কারণে কোনও অতি সুন্দর জিনিসকেও কি মলিন মনে হতে পারে? মানুষ চরম দুঃখের সময়েও শিল্প-সাহিত্যের কাছে গিয়ে সান্ত্বনা পায়। তার চেয়ে অনেক তুচ্ছ কোন কারণে কি শ্রেষ্ঠ শিল্প থেকেও চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে?

তা হলে গোড়া থেকে খুলে বলতে হয়।

এবারের ট্রিপে আমাদের চমৎকার একটি পরিকল্পনা ছিল। লন্ডনের নেহরু সেন্টার থেকে আমি একটি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম এক সন্ধ্যায় কবিতা ও গল্পপাঠের। স্বাতীর আমন্ত্রণ ছিল টরেন্টোর বঙ্গ-সম্মেলনে, আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ উপলক্ষে একটি সেমিনারে সে অংশগ্রহণ করবে, তাছাড়া আনন্দ পাবলিশার্সের বইয়ের স্টলেও ওকে থাকতে হবে 'যোগাযোগ'-এর পক্ষ থেকে।

অন্যান্য বারের মতন এবারেও আমাদের প্রথম গন্তব্য প্যারিস। অসীম রায়ের বাড়ি। ও বাড়িটা অনেকটা আমাদের নিজেদের বাড়ির মতনই হয়ে গেছে এখন। আমি স্বাতীকে প্যারিসে রেখে লন্ডনের অনুষ্ঠানটি সেরে ফিরে এলাম ভাস্করকে সঙ্গে নিয়ে। অসীম এর মধ্যে আমাদের বেড়াবার সব পরিকল্পনা ছকে রেখেছে। জোগাড় করে রেখেছে অনেক রকম ম্যাপ। গাড়িতে ঘোরা হবে চারটি দেশ, ফ্রান্স, সুইটজারল্যান্ড, ইটালি ও জার্মানি। এই পরিকল্পনায় একটাই শুধু অস্বস্তিকর ব্যাপার, এতখানি রাস্তা একাই গাড়ি চালাতে হবে অসীমকে। ভাস্কর বিলিতি কায়দায় গাড়ি চালায়, কন্টিনেন্টে পদ্ধতি অন্যরকম, ওখানে সে চালাতে সাহস পায় না। আমার আর স্বাতীর গাড়ি চালাবার প্রশ্নই নেই, আমরা অসীমকে অনবরত উৎসাহ দিয়ে যেতে পারি।

প্রথমে ফ্রান্সের বর্ডার পেরিয়ে সুইটজারল্যান্ড। সেখানে আমাদের চেনা দু'টি পরিবারের কাছে ভাগাভাগি করে আতিথ্য নেবার কথা ছিল। প্রথমে বহ্নিশিখা ও পূর্ণেন্দু চৌধুরীর বাড়ি, তারপর দীপাঞ্জনা ও তুষার ঘোষের বাড়ি, খাতির যত্ন পেয়ে আমরা অভিভূত।

আমাদের চারজনের মধ্যে স্বাতীরই এই প্রথম সুইটজারল্যান্ডে পদার্পণ। প্রকৃতি এখানে সুন্দরের যথাসর্বস্ব যেন উজাড় করে দিয়েছে। অবশ্য আমাদের কাশ্মীরও কিছু কম নয়। সুইটজারল্যান্ড দেখতে দেখতে কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে, আর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। ঐ সুন্দরের মধ্যে কী নিষ্ঠুর হানাহানি চলছে, আর সুইটজারল্যান্ড কত শান্ত!

যাই হোক, পুরো ভ্রমণ বৃত্তান্ত এখানে লেখা যাবে না, তাহলে মহাকাব্য হয়ে যাবে। প্রায় এক মাস ধরে ঘুরতে ঘুরতে আমরা পৌঁছেছিলাম জার্মানিতে ট্রুবার্টি—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর বাড়িতে। তার মধ্যে এবারে শুধু ফ্লোরেন্সের কথা।

সুইটজারল্যান্ড থেকে আল্‌পস পর্বতমালার পেটের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আমরা

পৌঁছলাম ইটালি। প্রথমে মিলান শহরে এক রাত্রি, তারপর ভিনিসে যাবার পথে অতি চমৎকার, ছোট্ট ভিসেনজা, মধ্যযুগীয় একটি শহরে অতি উপভোগ্য দুটি রাত্রি কাটল। আমাদের মূল টার্গেট ফ্লোরেন্স।

সব দেশেই চেনাজানা বন্ধু-বান্ধব ছড়িয়ে আছে। কারুর না কারুর বাড়িতে থাকা যায়। কিন্তু ইটালির এই উত্তর দিকটায় সে রকম কোনও চেনা নেই, যে কোনও শহরে পৌঁছেই আগে খুঁজতে হয় হোটেল। অসীমের সঙ্গে ভ্রমণে কোথাও সেই ঝামেলা নেই, যে কোনও শহরে পৌঁছেই সে আগে সস্তা হোটেল না খুঁজে কিছুতেই স্বস্তি পায় না। তাতে তার অতিরিক্ত পরিশ্রমও সহ্য করে নেয়।

ইটালি অতি মনোরম দেশ। মানুষের শিল্পরুচির শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির অনেক নিদর্শন রয়েছে এদেশে। প্রকৃতিও অপরূপ। আবার সেই সঙ্গে চোর, পকেটমার, ছিনতাইবাজদের জন্যও ইটালি বিখ্যাত। গাড়িতে একটা ক্যামেরা রেখে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে কেউ এসে গাড়ির কাচ ভেঙে সেই ক্যামেরা চুরি করে নিয়ে যায়। গোটা গাড়িটাই চুরি হয় প্রচুর। হোটেলগুলো যে কত রকমভাবে ঠকায়, তার ঠিক নেই। প্রতিটি ভ্রমণ পুস্তিকায় এই সব সাবধান বাণী লেখা আছে।

ফ্লোরেন্সে পৌঁছে হোটেল নির্বাচনের ভার ভাস্কর অসীমকে নিতে রাজি হল না। শহর থেকে হোটেল বুক করে দেবার ব্যবস্থা আছে। সরকারি তালিকাভুক্ত ঐ সব হোটেলে খুব একটা জোচ্চুরি হবে না, এমন আশা করা যায়। স্টেশনে ভিড়, তারই মধ্যে ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ লাইন দিয়ে ভাস্কর হোটেল রিজার্ভেশনের স্লিপ নিয়ে এল।

অসীমের জীবনে বোধহয় এই প্রথম অভিজ্ঞতা। কোন হোটেলের ঘর একেবারে না দেখে সেখানে থাকতে রাজি হওয়া।

হোটেলটি বেশ সাধারণ কিছু নয়। ঘরগুলি ছোট ছোট, জানলা দিয়ে কিছুই দেখার নেই, বাথরুমে একটু পাশ ফিরতে গেলে মাথা ঠুকে যায়। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সমস্যা হল গাড়িটাকে নিয়ে। এ হোটেলে গাড়ি রাখার জায়গা নেই, সামনের রাস্তাতেও গাড়ি পার্ক করা যাবে না। তাহলে গাড়িটা থাকবে কোথায়? হোটেলের এক কর্মী জানালেন একমাত্র উপায়, চারদিনের জন্য গাড়িটাকে কোনও গ্যারাজে রাখা। ফ্লোরেন্সের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির কাছে কাছে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না, পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়, সুতরাং এ ক'দিন গাড়িটা কোনও কাজেই লাগবে না। বেশ গ্যারাজেই রাখা হোক। প্যারিস শহরে গাড়ি রাখা নিয়ে গ্যারাজ ভাড়া নিয়ে কিছু বলে দেয়নি। মাত্র চারদিনের জন্য গ্যারাজ ভাড়া আমাদের টাকায় প্রায় কুড়ি হাজার!!!

হোটেলে শুধু ব্রেকফাস্ট দেয়, খাওয়া বাইরে। এর আগেও প্রত্যেকবার বেড়াবার সময় আমাদের মধ্যে একজন হয় ট্রেজারার। প্রত্যেকেই কিছু কিছু টাকা দিয়ে রাখে। হিসেব রাখার ব্যাপার নেই, সেগুলো ফুরিয়ে গেলে আবার কিছু কিছু জমা দিতে হয়। এবারে ট্রেজারার ভাস্কর, ও অনেক আগে লন্ডন থেকে পাউন্ড ভাঙিয়ে সুইস ফ্রাঁ আর ইটালিয়ান লিরা নিয়ে এসেছে প্রচুর, তার থেকেই খরচ চলছে, আমাদের প্রায় কিছুই দিতে হয়নি, এবার দিতে শুরু করতে হবে। ভাস্কর ট্রেজারার হলেও কোথায় কখন খাওয়া হবে তা নির্বাচন করার অধিকার অসীম কিছুতেই ছাড়বে না। স্বাতী মাঝে মাঝে নিজস্ব দু'একটা ইচ্ছে প্রকাশ করলেও অসীম ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলে, পরে দেখা যাবে।

সারাদিন ঘোরাঘুরি, দুপুরে স্যান্ডউইচ জাতীয় সাধারণ কিছু খেলে দিন কেটে যায়, রাত্তিরে কোনও উত্তম রেস্তোরাঁয় চিয়ান্টি ওয়াইন সহযোগে স্থানীয় বিশেষত্ব মণ্ডিত খাদ্য সম্ভারের স্বাদ উপভোগ। ইটালিয়ান রান্নার খ্যাতি জগৎ জোড়া।

প্রথম দিনটি বেশ ভালই কাটল।

ফ্লোরেন্স শহরটি শুধু শিল্প সম্পদের জন্যই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্যই, প্রাচীন সুন্দর শহরটিকে ঘিরে আধুনিক বাড়ি-ঘরও তৈরি হয়েছে প্রচুর।

তোমাদের তো অন্য আর কিছুতে আগ্রহ নেই, আমরা শুধু শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত অংশ আর ছবি, ভাস্কর্য দেখতেই এসেছি। সুখের বিষয়, সেই সবই একটি এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ, পায়ে হেঁটে হেঁটে দেখতে হয়।

মধ্যযুগে এই শহরে গেল্‌ফ আর গিবেলিন নামে দু'টি পরিবারের অনবরত সংঘর্ষ চলত। অনেকটা রোমিও এবং জুলিয়েটের দু'টি পরিবারের মতন। অবশ্য সেরকম কোন রোমান্টিক কাহিনী এ শহরের সঙ্গে জড়িয়ে নেই। ১৫২৮ সালে অভিজাতদের ঝগড়াঝাঁটিতে তিতিবিরক্ত হয়ে ফ্লোরেন্সের নাগরিকরা তখনকার রাজকুমারকে দূর করে দেয়। এই শহরের রাজা হিসেবে ঘোষণা করে দেয় যীশুখ্রীষ্টের নাম, তাঁর মা মেরি এই শহরের রানী। এবং শিল্পীদের রাজা মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ওপর ভার দেওয়া হয় শহরটিকে সাজাবার। সেই মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর কীর্তিরই অনেকখানি রয়ে গেছে এখনকার দ্রষ্টব্য হিসেবে। শহরের প্রায় মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে আর্নো নদী, বেশ ছোটই, ইওরোপের কোন নদীই আমাদের গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র, এমনকি রূপনারায়ণের সঙ্গে তুলনীয় নয়। আর্নোনদীর দক্ষিণ তীরেই শহরের মূল অংশ।

শুধু ছবি বা ভাস্কর্য নয়, পাঁচশ থেকে ছ'শ বছরের পুরনো প্রাসাদগুলিও ঘুরে ঘুরে দেখবার মতন। তাতে অবশ্য পা ব্যথা হয়ে যায়। আমার একটা হাঁটুতে কিছুদিন ধরে ব্যথা হচ্ছে, সেই জন্য চারজনের মধ্যে আমিই এবার সবচেয়ে কমজোরি। ভাস্করেরও আগে পায়ে ব্যথা ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে চীনে বেড়াতে গিয়ে প্রচুর হাঁটতে হয়েছে বলে ওর নাকি ব্যথা সেরে গেছে। আমাকে মাঝে মাঝেই কোথাও বসতে হয়।

স্বাতীর অবস্থা প্রবল তুফানের মতন। শিল্প সৃষ্টি দেখে ও যত আনন্দ পায়, তেমন আর কিছুতেই পায় না। প্রত্যেকটি জিনিস ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেই। কিছুই বাদ দেবে না। গির্জাগুলি দেখতে দেখতে একঘেয়ে হয়ে গেলেও ও সব গির্জার সবটুকু দেখবেই। অসীমও ওর সঙ্গে তাল দেয়, ভাস্কর খানিকটা নিমরাজি, আমি মাঝেমাঝে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হই। অনেক বছর আগে আমি রোম ও সন্নিহিত অঞ্চল দেখে গেছি, কিন্তু উত্তর ইটালিতে এবারে প্রথম আসা। সব কিছু তো দেখতে হবেই।

একটি বড় চত্বর, যাকে এরা পিয়াৎসা বলে, সেটি যেন খোলা আকাশের নিচে এক ভাস্কর্যের মিউজিয়াম। প্রখ্যাত ভাস্করেরা তাদের সৃষ্টিগুলি ঘরের মধ্যে আটকে না রেখে বাইরেই সাজাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এসুদে শিল্প-চোর ও ভ্যান্ডালদের উপদ্রবে সেগুলি মিউজিয়ামের ঘরে সতর্ক পাহারায় রাখতে হয়।

এই পিয়াৎসায় রয়েছে ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। অবশ্য তার অধিকাংশই নকল। যেমন, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর অমরসৃষ্টি ডেভিড এখানেই ছিল বহুকাল, এখন সেটি সরিয়ে নিয়ে রাখা হয়েছে অ্যাকাডেমিয়াতে, তার অবিকল একটি নকল তৈরি করা হয়েছে এখানে বসাবার জন্য। সেই বিশালকায় নগ্ন ডেভিডের পাশে রয়েছে শুধু ডুমুরপাতায় লজ্জাস্থান ঢাকা ফিলোমন। আরও অনেক মূর্তি, অনেকক্ষণ বসে দেখতে ইচ্ছে করে। নকলগুলিও কোন বড় শিল্পীর কাজ।

মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর 'পিয়েতা' আমরা দ্বিতীয় দিনেই দেখে নিয়েছিলাম। নইলে আর পরে হলে, আমি হয়তো ওটাও উপভোগ করতে পারতাম না। এই পিয়েতার ছবি আগে কত বইতে দেখেছি, কিন্তু সামনা সামনি দেখার অভিজ্ঞতাই অন্যরকম।

ক্রুশকাঠ থেকে নামিয়ে আনা পূর্ণাবয়ব যীশুকে শোয়ানো হয়েছে তার মায়ের কোলে। দু'হাত ছড়ানো, একটা পা সামনের দিকে। মেরির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ, কী দারুণ বিমর্ষ তার মুখ। এই ব্যক্তিটি যোসেফ হতে পারে, কিন্তু এর মুখখানির আদল মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর নিজের মুখের মতন। শিল্পী নিজেকে কেন ঐ বিমর্ষ মানুষটির মধ্যেই দেখতে চেয়েছেন, তা কে জানে! প্রত্যেকটি মূর্তিই পূর্ণাবয়ব, বাদামি রঙের মর্মর পাথরের। প্রায় আট বছর পরিশ্রমের পর এই পিয়েতা সম্পূর্ণ গড়া হলে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পেটাতে থাকেন সজোরে, যীশুর হাত

পা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কয়েকজন ছুটে এসে শিল্পীকে জোর করে চেপে না ধরলে সম্পূর্ণ মূর্তিটাই ধ্বংস হয়ে যেত। শিল্পীর কী গভীর অভৃপ্তি! এর জন্য যেন শিল্পকার্যটি আরও মহিমময় হয়ে উঠেছে।

পরে অবশ্য হাত পায়ের টুকরোগুলো অতি সাবধানে জোড়া লাগানো হয়েছে। কিন্তু মার্বেল কি নিখুঁতভাবে জোড়া যায়? দাগ বোঝা যায় স্পষ্ট। সেই দাগগুলির মধ্যে লেখা আছে ইতিহাস।

তৃতীয় দিনে একটু বেলা করে আমরা বেরিয়েছি। হোটেল থেকে দর্শনীয় এলাকাটি যেতে পনের কুড়ি মিনিট লাগে। রাস্তায় সব সময়ই ভিড়। জুন মাস, প্রকৃত পর্যটন কাল এখনও শুরু হয়নি, বেশ গরম, প্রায় কলকাতার গরমকেও ছাড়িয়ে যায়, এর মধ্যেই প্রচুর ভ্রমণকারীতে শহর ভর্তি। এই গরমে জ্যাকেট পরা যায় না। জ্যাকেট পরার একটা সুবিধে, অনেকগুলি পকেটে অনেক কিছু রাখা যায়। ভেতরের পকেটে দরকারি জিনিস সুরক্ষিত থাকে।

আমার পরনে জিনস আর একটা চওড়া ডোরা কাটা লাল-কালো টি-সার্ট। ঐ টি-সার্টটা পরাই আমার কাল হয়েছিল। অত উজ্জ্বল রঙের জন্য ভিড়ের মধ্যেও আমার দিকে মানুষের চোখ পড়ে।

অসীম বেশ লম্বা, সে এগিয়ে যাচ্ছে অনেকটা। ভাস্কর আর স্বাতী খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে, দোকানের শো-কেসে জিনিসপত্র দেখছে। হঠাৎ চারটি মেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। তাদের বয়েস ষোল থেকে পঁয়তিরিশের মধ্যে। একজনের পেটটা উঁচু, সে আমার সামনে এসে পেটটা চাপড়ে কাতর গলায় ভিক্ষে চাইল। আমি কিছু বলার আগে অন্য তিনটি মেয়ে আমার গা ঘেঁষে বলতে লাগল, দিতেই হবে, দিতেই হবে। তারপর দু'জন চেপে ধরল আমার দু'হাত, রীতিমতন জোরে। আমি দিশেহারা হয়ে একি একি বলতে লাগলাম, মেয়েদের তো জোর করে ঠেলেও দেওয়া যায় না। সেই অবস্থায় দু'পা এগোতেই একটা শব্দ শুনে পেছন ফিরে দেখি আমার মানিব্যাগটা পড়ে আছে রাস্তার ওপরে। মেয়েগুলি আমাকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

হোটেলে রেখে আসা নিরাপদ নয় ভেবে আমি পাসপোর্ট আর টাকা-পয়সা সবসময় সঙ্গেই রাখি। যে মুহূর্তে আমি জানতে পারলাম যে এই মেয়েগুলি সাধারণ ভিখিরি নয়, পকেটমার, তক্ষুনি আমি ডান পকেট হাত দিলাম। না, পাসপোর্ট ঠিকই আছে। মানিব্যাগটা নিতে পারেনি, একজন পথচারি সেটা তুলে আমার হাতে দিল। কিন্তু আসল জিনিসটিই নিয়ে গেছে ওরা।

মানিব্যাগে অতি সামান্যই টাকা ছিল। আমার আসল টাকা, অর্থাৎ এই ভ্রমণের প্রায় যথাসর্বস্ব, ছিল একটা কাগজের খামে। ওরা আমার বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে মানিব্যাগ আর খাম দুটোই তুলে নিয়েও মানিব্যাগটা ধরে রাখতে পারেনি, হাত থেকে পড়ে গেছে, কিন্তু খামটা ঠিকই নিয়েছে।

কয়েক মুহূর্তের মাত্র ব্যাপার, আমি হতভম্বের মতন শুধু বলছি, যাঃ নিয়ে গেল, নিয়ে গেল। মেয়েগুলি পাশের একটা গলিতে ঢুকে পালাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, ততক্ষণে ভাস্কর আর স্বাতী এসে জিজ্ঞেস করছে, কী হয়েছে, কী হয়েছে, কিছু লোক জমে গেছে আমাকে ঘিরে, তাদের কেউ কেউ বলছে, নিয়ে গেল তো, এ মেয়েগুলি এরকমই। মেয়েগুলিকে তখনও ধরা গেলে কাজ হত। কিন্তু যে কয়েক মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটা বুঝে উঠতে সময় লাগল তার মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল সেই চারটি মেয়ে। গলির মোড়ে এসে আর ওদের দেখা গেল না।

মেয়েগুলি ইটালিয়ান নয়, খুব সম্ভবত যুগোস্লাভিয়ার রিফিউজি অথবা যাযাবরী। অত্যন্ত নিখুঁত তাদের পরিকল্পনা। একজন গর্ভবতী সেজে সামনে দাঁড়িয়ে সহানুভূতি কাড়তে থাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়া যায় না। অনুরোধের ছলে দু'জন আমার দু'হাত চেপে ধরেছে। আর একজন সেই ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে পকেটে।

ওদের ভাষা দেখেই ভাল বলতে হবে। যদি ওঁ পকেটের বদলে অন্য পকেটটা হাত ঢোকাতো, পাসপোর্ট দুটো সহজে নিতে পারত না, নিলেও কোন লাভ হত না, ফেলে দিত। ওঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে যদি মানিব্যাগটা নিতে পারত, তাহলেই তো টাকা থাকে, [illegible] সেটা নিলেও আমার এমন কিছু ক্ষতি হত না। [illegible] বাড়ি নিয়ে ঐ ব্যাগ খুলে [illegible]।

তারপর থেকে আমার অবস্থা কেমন যেন নির্বোধের মতন হয়ে গেল। সবাই আমাকে বলতে লাগল, এটার বদলে কেন, ওটা করলে না? কিন্তু টাকা কেন স্বাতীকে রাখতে দিলে না। প্যান্টের পকেটে ওরকমভাবে কেউ টাকা রাখে? অন্তত ঐ পকেটটা যদি [illegible] দিয়ে, কিংবা [illegible] রাখতে ওপরে, তা হলে নিতে পারত না বাঙালী। সবই ঠিক। অথচ কারুরই আগে মনে পড়েনি।

আমার মানিব্যাগ ব্যবহার করার অভ্যেস নেই। কলকাতায় কিংবা ভারতবর্ষে যখন ঘুরি, পকেটে ব্যাগ থাকে না। আমার পকেটে, প্যান্টের পকেটেই টাকা রাখি। বাইরে গেলে কেন যে মানিব্যাগ নিয়ে যাই কে জানে! এর আগে, আমার একবারই মাত্র পকেটমার হয়েছে। [illegible]

[illegible]

বিদেশে একবার জেলে যাবার উপক্রম হয়েছিল

[illegible]

এখানকার বর্তমান অধিবাসীদের কোনও মিল নেই। সব কিছুই নিয়ম কানুনে বাঁধা, মানুষজনের চলাফেরাও যেন যান্ত্রিক। আমাদের জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঠাসা প্রোগ্রাম, কারখানা দেখতে যাওয়া, যৌথ খামার, বিশ্ববিদ্যালয়, লেখক সমিতি, প্রকাশক সমিতি, শান্তি সমিতি ইত্যাদি নানান সমিতির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা, সে সব আলোচনাও নিছক দায়সারা। আসলে বেশির ভাগ সরকারি কর্মচারীই তখন সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ফুঁসছে, পার্টির খবরদারি সহ্য করতে পারছে না, আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় সেটাই প্রাণপণে গোপন করার চেষ্টা।

সবগুলো জায়গায় আমাদের যাবার ইচ্ছে থাক বা না থাক, যেতেই হবে। সেটাই আমার দায়িত্ব। আমার অবশ্য পরপর দৃশ্যবদল পছন্দ হয় না, অনবরত নতুন নতুন গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগে না। মাঝেমাঝেই আমি বলি, যাও, তোমরা কারখানা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় দেখে এস, আমি নদীর ধারে অপেক্ষা করছি।

প্রাগ শহরটির দুটি ভাগ। নতুন অংশটির বিশেষত্ব নেই, শুধু লম্বা লম্বা বাড়ি আর অফিস-আদালত, কিন্তু প্রাচীন অংশটি বড়ই দৃষ্টিনন্দন। পুরনো আমলের পাথরের বাড়ি, দূরে দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দীর রাজপ্রাসাদ। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী, সে নদীর নামটা উচ্চারণ করা শক্ত, ভলাটাভা বলা যেতে পারে (Vlatava River), খুব চওড়া নয়, দু'পাশে সবুজ ঘাস, গালিচার মতন, সেখানে নানা রঙের পোশাক পরা ছেলেমেয়েরা রোদ পোহাচ্ছে শুয়ে শুয়ে। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করছে, একটু একটু আদর, খুব বেশি লজ্জাহীন নয়। অনেকে আবার পাশাপাশি শুয়ে একই বই পড়ছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে কৌতূহলী হয়ে লক্ষ করলাম, অনেকেই যেটা পড়ছে, তা ছাপা বই নয়, কোনও বইয়ের জেরক্স কপি। ইংরেজি জানা ছেলেমেয়ে খুঁজে পাওয়া শক্ত, তবু বেশ কয়েকজনকে প্রশ্ন করার পর একজন বুঝতে পেরে বলল, তারা পড়ছে ফ্রানৎস কাফকার বই!

—এ বই কিনতে পাওয়া যায় না?

—না।

—কেন?

—হারামজাদারা ফ্রানৎস কাফকার বই নিষিদ্ধ করেছে!

সে হারামজাদারই সমতুল্য একটা গালাগাল ব্যবহার করেছিল সরকারের বিরুদ্ধে।

এটা একটা মজার ব্যাপার। ফ্রানৎস কাফকার জন্ম-কর্ম এই শহরে। তার বাড়িটি এখনও আছে, অনেকেই দেখতে যায়। এ দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক, আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা তাঁর জন্মভূমিতে নিষিদ্ধ কেন? তাঁর লেখায় তো রাজনীতি নেই। তিনি কমিউনিজমের বিরুদ্ধেও কিছু লেখেননি। তাঁর লেখা অ্যাবস্ট্রাক্ট, সমাজ বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে, শুধু সেই জন্য?

প্রকাশক সমিতির সভাপতিকে আমি পরে জিজ্ঞেসও করেছিলাম, আপনারা কাফকার বাড়ি সাজিয়ে রেখেছেন অথচ তাঁর লেখা নিষিদ্ধ করেছেন কেন?

—নিষিদ্ধ তো নয়!

—তাঁর বই পাওয়া যায়?

—হ্যাঁ, পাওয়া যাবে না কেন?

—আমি যে কয়েকজনের কাছে শুনলাম, তাঁর বই জোগাড় করা সম্ভব নয়।

—তা হলে বোধহয় এখন আউট অফ প্রিন্ট হয়ে আছে।

—সব বই আউট অফ প্রিন্ট? কতদিন ধরে আউট অফ প্রিন্ট বলতে পারেন?

তিনি খানিকটা ইতস্তত করে, কাগজপত্র দেখে বললেন, কুড়ি বছর!

একজন বিশ্ববিখ্যাত লেখকের বই কুড়ি বছর ছাপা হয়নি, অথচ নিষিদ্ধ নয়, এর চেয়ে মিথ্যে কথা আর কী হতে পারে?

যারা পড়বার তারা কিন্তু ঠিকই পড়ছে। বই যে কখনও নিষিদ্ধ করে রাখা যায় না, তা শাসক শ্রেণীর গাড়লরা কোনও দেশেই বোঝে না।

ভলাটাভা নদীর ওপর যে সেতু, সেটির কিন্তু ইংরেজি নাম, চার্লস ব্রিজ। বারবার সেই সেতু পারাপার করতে করতে নদীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়। এক একবার আমি ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে গিয়ে বসি, নদীর সঙ্গে বাংলায় কথা বলি। নদী বেশ বুঝতেও পারে মনে হয়।

চার্লস ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে একজন লেখককে সেই নদীর বুকে পয়সা ছুঁড়ে দিতে দেখে আমার বেশ মজা লেগেছিল। আমাদের দেশে এরকম অনেক দেখেছি। গঙ্গা নদী যে কত পয়সা খেয়েছে তার ঠিক নেই। এ দেশেও সে রকম সংস্কার আছে নাকি? রোম শহরে একটা ঝরনায় পয়সা ফেলে অনেক লোককে মানত করতে দেখেছি বটে।

ভলাটাভা নদী তেমন গভীর নয় এখন। জলও খুব স্বচ্ছ। তলায় পয়সা পড়ে আছে, দেখা যায়।

কয়েকদিন পর আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল শ্লোভাকিয়ার দিকে। এখানকার রাজধানীর নাম ব্রাতিশ্লাভা। যাবার আগে আম্মার কাছ থেকে বিদায় নিতে হল প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে। যদিও মনে মনে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তার ব্যবহার ছিল কড়া হেডমাস্টারনীর মতন!

ব্রাতিশ্লাভায় এসে বোঝা গেল, দু'অঞ্চলে অবস্থার তফাত কত প্রকট। একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থা। এখানে চাপা দেবার চেষ্টাও নেই। সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যেই অভিযোগ জানায়, এমনকি আমাদের মতন বিদেশিদের কাছেও। এদের অভিযোগ দু'রকম। স্থানীয় সরকারের বিরুদ্ধে এবং চেকদের দাদাগিরির বিরুদ্ধে। সেই জন্যই শ্লোভাকিয়া পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, সে খবর শুনে আশ্চর্য হইনি। যেমন মুসলমান ধর্মও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক রাখতে পারেনি, সেইরকম কমিউনিজমও চেক ও শ্লোভাকিয়ার মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে পারেনি।

এক জায়গায় আমরা কনসার্ট শুনতে গেছি, হঠাৎ বাজনা থামিয়ে তরুণ বেহালাবাদকটি বলতে শুরু করল, জানেন, সরকার আমাদের পয়সা দেয়? তাতে খাওয়া জোটে না। আমি বিদেশে যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছি, তাও যেতে দেবে না শুয়োরের বাচ্চারা!

এরকম আমি আর কোন দেশে শুনিনি।

ব্রাতিশ্লাভার এক বৃদ্ধের মুখে একটা ব্যাপার শুনেও মজা লেগেছিল। শহরটির এক পাশে পাহাড়। তার ওপাশেই অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহর। বৃদ্ধটি বললেন, আগে (অর্থাৎ সোভিয়েত ব্লকে যাবার আগে) আমরা যখন ইচ্ছে ঐ পাহাড় পেরিয়ে ভিয়েনার কোনও রেস্তোরাঁয় চা খেতে যেতাম। এখন ওখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। যদি বা যাওয়ার অনুমতি মেলে, তাহলেও পূর্ব জার্মানির মধ্য দিয়ে দেড় হাজার মাইল ঘুরে যেতে হয়। অথচ ঐ পাহাড়ে উঠলেই শহরটা দেখা যায়!

এটা মজার ঘটনা নয়, করুণ। বৃদ্ধ অবশ্য বলছিলেন হাসতে হাসতে।

একজন বৃদ্ধ বললেন, আমি এখনও কমিউনিস্ট, এই আদর্শের জন্য লড়েছি। কিন্তু নেতাদের লোভ আর ক্ষমতা দখলের জেদাজেদি আর সাধারণ মানুষের ওপর অনর্থক কড়াকড়ির জন্য সে আদর্শ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা যে এই আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার জন্য আমার মতন বুড়োরাই দায়ী!

এবারে আসল ঘটনাটায় আসি।

ব্রাতিশ্লাভায় আমাদের অন্য গাইড ছিল। সে আমাদের বিমানে তুলে দিল। প্রাগে এসে বিমান বদল করে আমাদের যেতে হবে দিল্লিতে।

প্রাগে পৌঁছে আমরা জেনলাম, আমাদের পরবর্তী বিমান ১৫ ঘণ্টা পরে আসবে কোনও কারণে।

বিমান বন্দরে একজন সরকারি অফিসার উপস্থিত, সে আমাদের এই খবর জানিয়ে, করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, আমি তা হলে চলি?

আমরা এই পনের ঘণ্টা থাকব কোথায়?

অফিসারটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, সে তো আমি জানি না।

—আপনি জানেন না মানে?

—আজ রাত্রি আটটা পর্যন্ত আপনারা আমাদের অতিথি। তারপর তো আমাদের আর কোনও দায়িত্ব নেই।

—বিমান লেট হলে আমরা কী করতে পারি?

—তা তো আমি জানি না।

—আমরা রাতটা কি তাহলে এয়ারপোর্টে কাটাব?

—তা সম্ভব না, রাত এগারোটার পর কাককেও এয়ারপোর্টে থাকতে দেওয়া হয় না।

—তা হলে কি আমাদের হোটেলে থাকতে হবে? সে খরচ দেবে কে?

—তা তো আমি জানি না।

ভদ্রলোক বারবার তা তো আমি জানি না, তা তো আমি জানি না বলে সত্যি সত্যি বিদায় নিয়ে চলে গেল, আমরা যাকে বলে অগাধ জলে! কারুর কাছেই বিশেষ টাকাকড়ি নেই। কোন হোটেলে থাকব, কে পৌঁছে দেবে, কিছুরই ঠিক নেই। আগে যে-হোটেলে ছিলাম, সেটা বিরাট হোটেল, অনেক খরচ।

ভারতীয় দূতাবাসে ফোন করে যে সাহায্য চাইব, তারও উপায় নেই, কারণ সেটা শনিবারের রাত। শনিবার—রবিবার ফোন করলেও পাওয়া যাবে না।

এসব দেশের সব এয়ারপোর্টেই আর্মির লোক থাকে। সে রকম একজন জবরজং পোশাক পরা লোককে আমাদের অবস্থা খুলে বললাম। যদি তিনি আমাদের এয়ারপোর্টে রাত কাটাবার অনুমতি আদায় দেন।

আর্মি অফিসারটি সমবেদনার ভাব নিয়ে আমাদের কথা শুনলেন। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, যে খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু তাঁর করণীয় কিছু নেই। এয়ারপোর্টে থাকতে দেবার অনুমতি তিনি দিতে পারেন না। আরও উঁচু জায়গা থেকে আদেশ আনতে হবে, সেটাও শনিবার রাতে সম্ভব নয়।

তিনি কাছাকাছি কয়েকটা সস্তা হোটেলের ঠিকানা বাতলে দিলেন।

ছ'জন মিলে এক ট্যাক্সিতে যাওয়া যাবে না। এসব দেশে চারজনের বেশি কিছুতেই নেয় না। প্যারিসে দেখেছি, তিনজনের বেশি নেবে না। সামনের সিটে বসতে দেয় না কোনও যাত্রীকে।

এখন সুখদাকুমারীর অনুরোধে আমাকেই হোটেল খোঁজার দায়িত্ব নিতে হল।

ভাষা জানি নেই। ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ঘোরা পথে নিয়ে যাবে কিনা, কী করে বুঝব। অনেক ঘুরে ঘুরে এক একটা হোটেল, কোনও হোটেলেই এক সঙ্গে ছ'জনের জায়গা নেই।

এই অবস্থায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে কেউ রাজি না। সবাই ভয় পাচ্ছে। এখানকার সরকারের ব্যবহারে আমাদের হতভম্ব অবস্থা।

হোটেল খুঁজতে গিয়ে ট্যাক্সি ভাড়ায় আমার নিজের অনেক পয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমি প্রস্তাব দিলাম, আমরা প্রথমবার এসে যে ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে ছিলাম, সেখানেই যাওয়া যাক। সেটা তবু আমাদের চেনা। অতবড় হোটেলে, সেখানে এক সঙ্গে ছ'জনের ঘর পাওয়াও সম্ভব।

তাই হল, ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে এসে আমরা আমাদের দুরবস্থার কথা বুঝিয়ে বললাম। আগে ছিলাম সরকারি অতিথি। এখনকার আমাদের অবস্থা যা, যা খুশি ব্যবহারে অর্ডার দিয়ে সই করে দিয়েছি। এখন থাকতে হবে নিজেদের পয়সায়। আমাদের দুটো সস্তার ঘর চাই।

এসব কথা বুঝিয়ে বলতেও আমাদের কম ঝক্কি হয়নি। প্রায় কেউই ইংরেজি বোঝে না। এ ওকে ডাকে, সে তাকে ডাকে। শেষ পর্যন্ত যে বুঝল, সেও কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, এ ব্যাপারে তার কিছু করার নেই। আমাদের পয়সা দিয়েই থাকতে হবে, দেবে হবে। তবে, একটা বড় ঘর আছে, সেই এক ঘরে চারটি খাট, আর মেঝেতে বিছানা পেতেও শুতে পারে দু'জন। তাতে খরচ কম পড়বে।

অগত্যা আর উপায় কী। নারী-পুরুষ মিলে ছ'জন এক ঘরে। কেউ জোরে নাক ডাকে, কারুর পাতলা ঘুম। কারুর খালি গায়ে শোওয়া অভ্যেস, অথচ মহিলাদের সামনে জামা খোলা যায় না।

সব খাবারেরই বেশ দাম, তাই আমরা খেলাম শুধু সুপ। আর পাউরুটি।

ঘর ভাড়া ছ'জন সমান ভাগ করে দেবে। আর কিছু বর্জিত। আমার টাকাটা আমি রাত্রেই সুখদাকুমারীর হাতে তুলে দিলাম, কারণ আমার সঙ্গে অন্য পাঁচজনের একটা তফাত আছে। এই সব সরকারি প্রতিনিধি দলে যারা যায়, তারা সবাই কটিন মতন ঘোরে ফেরে এবং নির্দিষ্ট দিনে দেশে ফিরে আসে। আমার মাথায় পোকা আছে। অত সহজে ফিরতে ইচ্ছে করে না। সেই জন্যই সরকারি খরচে কোনও দেশে গেলেও, তার কাছাকাছি কোনও দেশ আমার নিজের খরচে দেখে আসতে ইচ্ছে করে।

এবারেও ঠিক করেই এসেছিলাম, আমি দলের সঙ্গে ফিরব না। ইস্তানবুল শহরটি দেখে যাব। ইস্তানবুলের নাম এক কালে ছিল কনস্ট্যান্টিনোপোল। ইতিহাসের দিক থেকে এরকম রোমাঞ্চকর শহর আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। এই শহরের আধখানা এশিয়ায়, আধখানা ইওরোপে। তুরস্ক থেকে আমন্ত্রণ পাবার আশা খুব কম। সেই জন্য আমি দিল্লি থেকে ভিসা নিয়েই এসেছি।

অন্য সকলের দেশে ফেরার প্লেন বেলা এগারোটায়, কিন্তু আমার ইস্তানবুলের ফ্লাইট ভোরবেলা। সুতরাং, অন্যদের ঘুম না ভাঙিয়েই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

কী করে ভোর চারটে উঠব, সেই চিন্তায় আমার সারা রাত ঘুমই এল না।

যথা সময়ে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। হোটেলের কাউন্টারে যে লোকটি ডিউটি দিচ্ছে, তারও চোখ ভরা ঘুম। আমার পাসপোর্ট ফেরৎ চাইতে সে একগাদা পাসপোর্টের মধ্য থেকে সেটা বার করে দিল, আমার ছবি-সমেত তিন কপি আধেক বেরিয়ে আছে।

হোটেলের দারোয়ানদের ট্যাক্সি ধরে দিতে বললাম। ট্যাক্সি আর আসেই না। দেরি করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। নিজেই সুটকেশ হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ডেকে নিলাম একটা ট্যাক্সি।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে একটা খবর জেনে খুব স্বস্তি হল। আমার ফ্লাইট ঠিক সময়ে আছে। আর কোনও দেশে আমন্ত্রিত হয়ে এরকম নিজে ট্যাক্সি ডেকে একা একা এয়ারপোর্টে আসতে হয়নি। এখানে গতকাল রাত আটটায় আমাদের আতিথ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে, তারপর অতিথিরা গোল্লায় যাক বা না যাক, তাতে এদেশের সরকারের কিছু আসে যায় না।

সুটকেশ চেক-ইন করে, একটা সিগারেট ধরাবার পর খানিকটা সময় নিয়ে, তারপর দাঁড়ালাম ইমিগ্রেশন কাউন্টারে। তেমন ভিড় নেই। একজন মহিলা পাসপোর্ট পরীক্ষা করছেন।

আমার পাসপোর্ট ও ভিসার কাগজটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করলেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে

গেল। একটু পরে পাসপোর্টটা আমায় দিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে বললেন। এটা কি তোমার পাসপোর্ট?

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। জীবনে কখনও এক সঙ্গে এমন বিস্ময় ও ভয় অনুভব করিনি।

বোমা ফাটার মতন শব্দ করে আমি বললাম, না!

পাসপোর্টের ছবিটা আমার নয়। ভিসার কাগজটা আমার। হোটেলের লোকটি অন্য লোকের পাসপোর্ট আমার ভিসার কাগজটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমিও ভিসার কাগজে আমার ছবিটা দেখেই নিয়ে চলে এসেছি। তা ছাড়া, সেই সময় লোকটি আমি কেন পরখ না নিয়ে চলে যাচ্ছি, আমার পরখ কে দেবে, এই নিয়ে কামেলা বাধাবার তাল করে আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিল।

ভদ্রমহিলা উঠে গিয়ে একজন আর্মি অফিসারকে ডেকে আনলেন।

সেই লোকটি শুনলেন সব কথা। তারপর ঠাণ্ডা ভাবে বললেন, ভদ্রমহোদয়। নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে একনই আমার গ্রেফতার করা উচিত। কারণ আপনি অন্যের পাসপোর্ট নিয়ে এ দেশ ছেড়ে বেরুবার চেষ্টা করছিলেন। সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাতে আপনার কারাদণ্ড হতে পারে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, এটা একটা ভুলেরই ব্যাপার। আপনাকে গ্রেফতার করলাম না। এখন আপনি কী করবেন?

আমার এমনই হতভম্ব অবস্থা যে মাথায় কিছু এল না।

এক ঘণ্টার মধ্যে ইস্তানবুলের প্লেন ছেড়ে যাবে। আমি জানি, পরের ফ্লাইট চারদিন পরে। সেই চারদিন আমার পক্ষে এখানে থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। চেকোস্লোভাকিয়ার ভিসা আমার সেদিনই শেষ, তাছাড়া টাকা-পয়সার প্রশ্ন তো আছেই।

এখন হোটেলে ফিরে গিয়ে পাসপোর্ট বদলে আনতে গেলে এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যাবে। আমার জন্য তো আর ইস্তানবুলের ফ্লাইট দাঁড়িয়ে থাকবে না।

তা হলে কী উপায়?

ইমিগ্রেশানের ভদ্রমহিলা বেশ সহানুভূতিশীল। তিনি বললেন, এখন আমরা যদি আপনাকে ছেড়েও দিই, আপনি ইস্তানবুলে এই নকল পাসপোর্ট নিয়ে ঢুকতে পারবেন না। এমনকি আপনার নিজের দেশ ইন্ডিয়াতেও তো আপনাকে আটকে দেবে। সেখানে আপনাকে অন্য পাসপোর্ট নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করার জন্য অ্যারেস্ট করবেই। তা ছাড়া, আপনি যার পাসপোর্ট নিয়ে চলে এসেছেন, সেও তো বিপদে পড়বে একই রকম।

এই পাসপোর্টটা দেবরাল নামে একজন হিন্দি লেখকের। সে বেচারি বোধহয় এখনও ঘুমোচ্ছে, কিছুই জানে না।

আর্মি অফিসারটি বললেন, আমরা কোনও অ্যাকশান নিচ্ছি না। আপনি চেষ্টা করে দেখুন, নিজের পাসপোর্ট নিয়ে আসতে পারেন কিনা।

হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট আসতে সময় লেগেছিল পঁয়তিরিশ মিনিট। ভোরবেলা রাস্তা একেবারে ফাঁকা ছিল। এখন যদি অন্য ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে যাই, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসা অসম্ভব। ঠিক আছে, ইস্তানবুল না হয় বাদ দিলাম, পরের প্লেনে অন্যদের সঙ্গে দেশে ফিরবই বা কী করে? সে ফ্লাইটে তো আমার বুকিং নেই। এদিককার ফ্লাইটে তিন-চারমাস আগে বুক না করলে সিট পাওয়া যায় না।

এদিকে আমার সুটকেশ চলে গেছে ইস্তানবুলের বিমানে।

ভাবছি, আর সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দলের কারুকে ফোন করে বলব, আমার পাসপোর্টটা এনে, অন্যটা নিয়ে যেতে? বুঝিয়ে বলব, জামাকাপড় পরে তৈরি হবে, কাউন্টারে এসে কথা বলবে, আমার পাসপোর্ট অন্য কারুকে দেবে কিনা ...।

যাই হোক, আমি হোটেলে ফোন করলাম।

এই তো। এখন যে কাউন্টারে রয়েছে, সে এক বর্ণ ইংরেজি জানে না। সে ফোন আমার কী সব বলে যাচ্ছে, আমিও তা বুঝছি না কিছুই। যত বলি, ইংরেজি জানা একজনকে ডাক, তাও সে বোঝে না।

হঠাৎ দেখি, কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে আন্না। এ যেন সমুদ্রে ডুবন্ত লোকের সামনে একটা কাঠখণ্ড। চোখাচোখি হতে আন্না এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বলল, সুপ্রভাত, সব খবর ভাল?

আমি তার হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, আন্না, আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি।

কড়ের বেগে ঘটনাটা বর্ণনা করতে হল আন্নাকে।

আন্নার মুখের রেখায় কোনও ভাবান্তর হল না। নিরস গলায় বলল, হোটেলের লোকেরা অন্যায় করেছে ঠিকই। অন্য পাসপোর্টে তোমার ভিসার কপি ঢুকিয়ে দিয়েছে। তোমারও ত্রুটি হয়েছে, হোটেল ছাড়ার সময় নিজের পাসপোর্ট খুব ভাল ভাবে দেখে নেওয়া উচিত। দেখা যাক, এখন কী করা যায়।

আমি বললাম, সময়টাই যে আসল। আর মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। এদিকে আমার সুটকেস—

এসব কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে সে টেলিফোন করল হোটেলে। ওদের ভাষায় কী বলতে লাগল, তা তো আমার বোঝার উপায় নেই। কিন্তু আন্না রীতিমতন গলা চড়িয়ে ধমকাচ্ছে। মনে হল, সে তাহলে সাধারণ গাইড নয়। তার অন্য কোনও সরকারি পরিচয় থাকতে পারে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে আন্না বলল, হোটেলের ওপর সব দোষ চাপিয়েছি। ওদের নামে নালিশ করার জন্য দেখিয়েছি। ওদের বলেছি একুনি একটা ট্যাক্সি স্ট্রাইভারের হাত দিয়ে তোমার পাসপোর্ট পাঠিয়ে দিতে। অন্যটা সেই নিয়ে যাবে।

এরপর অধীর অপেক্ষা। ঘন ঘন সিগারেট টানা। এয়ারপোর্টে অনবরত ট্যাক্সি ঢুকছে। কোন ট্যাক্সিতে আমার পাসপোর্ট আসবে। বুঝব কী করে?

ঠিক মিনিট পঁয়তিরিশের মাথায় দেখি, একজন ট্যাক্সিচালক একটা হাত জানলা দিয়ে বাইরে উঁচিয়ে রেখেছে। সেই হাতে একটা পাসপোর্ট।

এখনও বারো মিনিট সময় আছে। দৌড়ে গেলে আমাকে ইস্তানবুলের ফ্লাইটে উঠতে দেবে। আমার অতিথিরা পৌঁছে গেছে, আফ্রিকার কোনও দেশের, মালপত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তাকালাম আন্নার দিকে। এই মুহূর্তে তাকে কী সুন্দরী মনে হল। আন্নার সাহায্য না পেলে, এভাবে, এই সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট উদ্ধার করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। আন্নাকে নিয়ে আড়ালে অনেক মস্করা করেছি, কিন্তু এ দেশে সে-ই আমার সবচেয়ে উপকারী বন্ধু।

আমি তার কাছে গিয়ে বেশ আবেগের সঙ্গে বললাম, আন্না, তুমি আমার জন্য যা করলে—

আন্না বলল, যাও, আর ভদ্রতা করতে হবে না। এরপর ফ্লাইট মিস করবে।

সে আমার গালে ঠোঁট ছোঁয়াল।

আমার মনে হল, এমন মধুর আদর জীবনে খুব কমই পেয়েছি। ছুটে গিয়ে উঠে পড়লাম প্লেনে।

তারপর ইস্তানবুলে কয়েকদিন ঘুরে বেড়িয়েছি সম্পূর্ণ একা একা। কিন্তু সে তো অন্য গল্প।

ধানসিড়ি নদীর সন্ধানে

অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গে, ফরিদপুর জেলার এক গণ্ডগ্রামে আমার জন্ম। কিন্তু বাল্যকালে ফরিদপুর থেকে কলকাতায় অনেকবার এসেছি বটে, কিন্তু ওদিকে, আরও পুবে কখনো যাওয়া হয়নি। এমনকি ঢাকা শহরও দেখিনি। আমার প্রথম ঢাকা-দর্শন পাকিস্তান আমল শেষ হবার পর, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম মাসে।

তারপর বাংলাদেশে যাওয়া আসা করেছি অনেকবার, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকবারই আটকে গেছি ঢাকায়। বার দু-এক চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ভ্রমণ করেছি যদিও কিন্তু অন্য জেলাগুলি দেখার সুযোগ ঘটেনি। ঢাকার বন্ধুরা অন্য অনেক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বটে, কিন্তু আড্ডার নেশায় মেতে প্রতিবারই ঘনিয়ে এসেছে ফেরার দিন।

গত বছর অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন গণতন্ত্রের দিক থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য পৃথিবীর বহুদেশ থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সার্ক গোষ্ঠিভুক্ত দেশগুলি থেকেও প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ভারত থেকে দশজন, সেই ভারতীয় দলটির মধ্যে কী করে যেন দৈবাৎ আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এই দলে আরও দু'জন বাঙালি ছিলেন বটে, প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক আশিস নন্দী, দু'জনেই দিল্লি প্রবাসী, পশ্চিমবাংলা থেকে আমিই একমাত্র।

নির্বাচনের পর্যবেক্ষক, তাই সরকারি ভাবে দারুণ খাতির যত্নের ব্যবস্থা। বিমান থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে কূটনৈতিক বিভাগীয় ব্যক্তিরা ভি আই পি লাউঞ্জে নিয়ে গেলেন, তারপর তুললেন ঢাকার সর্বোত্তম হোটেলে। সর্বক্ষণের ব্যবহারের জন্য ড্রাইভার সমেত গাড়ি। খাওয়া-দাওয়া স্বাচ্ছন্দে'র কথা আর বর্ণনা দিয়ে কাজ নেই। কে বলবে যে এক দরিদ্র দেশে এসেছে আর এক দরিদ্র দেশের মানুষ!

ইওরোপ-আমেরিকা-জাপান থেকেও পর্যবেক্ষকরা এসেছেন, সকলকে শুধু ঢাকায় বসিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। তাই প্রস্তাব নেওয়া হলো যে পর্যবেক্ষকদের ভাগ ভাগ করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন জেলায়। আমাদের আপ্যায়নের ভার যাঁরা নিয়েছেন, বাংলাদেশের সেই সব কর্তা ব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গেই আমার আগে থেকে চেনাশুনা, তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো বিশেষ জেলা আমার পছন্দ কি না। তা হলে তাঁরা সেখানেই আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রায় কিছু না ভেবেই আমি বললাম, বরিশাল!

তাঁরা বেশ অবাক হয়েছিলেন। অনেকেই জানতেন যে আমার জন্মস্থান ফরিদপুর, তথা মাদারিপুরে। আগে মহকুমা ছিল এখন মাদারিপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা। আমি তো ইচ্ছে করলেই মাদারিপুর বেছে নিয়ে সেখানে গিয়ে স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ পেতাম। কিন্তু সেখানে যেতে আমার ইচ্ছে করে না।

আরও তো জেলা ছিল, তবু বরিশাল আমি বেছে নিলাম কেন? বরিশালে আমার তেমন চেনাশুনো কেউ নেই। আলাদা কোনো আকর্ষণ নেই। তবে কিছুদিন আগে তপনমোহন রায়চৌধুরীর লেখা স্মৃতি-রম্যকাহিনীতে বরিশাল সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছিলাম, সেই জন্য কি বরিশাল নামটা প্রথমে মনে এসেছিল?

আর একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটলো। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আর একজন যে পর্যবেক্ষককে আমার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হলো, সে আমার পূর্ব পরিচিত তো বটেই, আমার প্রিয় ও বিশেষ স্নেহভাজন ইমদাদুল হক মিলন। মিলন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার, অল্প বয়েস থেকেই সে দারুণ জনপ্রিয়, তা ছাড়াও তার মতন পড়ুয়া আমি খুব কম দেখেছি। বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় রচনা তার পড়া, তার স্মৃতিশক্তিও ভালো। মিলনের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। আমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য পররাষ্ট্র দফতরের এক তরুণ অফিসারকেও সঙ্গে দেওয়া হলো তার নাম আনোয়ার। বয়েস বেশ কম, প্রথম প্রথম তার ব্যবহার বেশ আড়ষ্ট মনে হয়েছিল। সে আমাকে মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায় বলে সম্বোধন করছিল। কোনো বাঙালির মুখে এ রকম সম্বোধন শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, এ ছেলেটি মেধাবী ছাত্র, পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। কেরিয়ার ডিপ্লোম্যাট হতে চায়, সাহিত্যের ধার ধারে না, আমি যে কিছু লিখি টিখি তা সে জানেও না। একদিন পরেই ভুল ভেঙেছিল, আনোয়ার আসলে বেশ লাজুক, রোমান্টিক, সাহিত্য প্রেমিক, নিজেও কিছু কিছু লেখে। আমি তার তুলনায় অনেক বয়স্ক লেখক বলেই সে প্রথমে স্বাভাবিক হতে পারেনি। এক সময় মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কি আপনাকে সুনীলদা বলে ডাকতে পারি?

নির্বাচনের দু'দিন আগে আমরা গাড়িতে যাত্রা করলাম বরিশালের দিকে। গাড়িতে বরিশাল? পুরোনো আমলের মানুষেরা একথা শুনলে বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলবেন। বরিশাল অনেক নদী ও জলাভূমি ঘেরা জেলা, ট্রেন লাইন নেই, স্থলপথে যাবার কোনো উপায়ই ছিল না বহুকাল। নৌকো বা স্টিমারই ভরসা। পরাধীন আমলে সাহেবরা খুলনা থেকে বরিশাল পর্যন্ত যাত্রীবাহী স্টিমার চালাতেন। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী স্টিমার সার্ভিস চালু করে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের পথ ঘাটের এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না। সর্বত্রই মসৃণ রাস্তা। এত নদী, সব জায়গায় এখনো ব্রিজ তৈরি হয়নি। কিন্তু গাড়ি কিংবা বড় বড় যাত্রীবাহী বাস ফেরিতে পার করে দেবার সুন্দর ব্যবস্থা। ফেরিঘাটে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। মোট ন'বার ফেরিতে নদী পার হতে হয়েছে, তার মধ্যে এক জায়গাতে সময় লেগেছে পৌনে দু'ঘন্টা।

ঢাকা থেকে এদিকে আসতে গেলে দুটি ঘাট দিয়ে পদ্মা পার হতে হয়। আরিচা ও মাওয়া। আমরা এসেছিলাম বিক্রমপুরের মধ্য দিয়ে মাওয়া ঘাটে। এই বিক্রমপুরে ইমদাদুল হক মিলনের পৈতৃক বাড়ি। সে হাত তুলে কিছুদূরে তার বাড়িটা দেখালো। আমি ঐ ভাবে আমার নিজের বাড়ি দেখাতে পারবো না। আমাদের মতন যাদের বাড়ির অস্তিত্ব এখনো ঐ অঞ্চলে আছে সেগুলি নাকি 'শত্রু-সম্পত্তি'। আমি কী করে আর একজন বাঙালির শত্রু হয়ে গেলাম, তা জানি না!

মাওয়া ঘাট থেকে যে স্টিমারে ওঠা হলো, সেটি মস্ত বড়, প্রায় জাহাজের মতন। দিগন্তবিস্তৃত পদ্মা। এখানকার ক্যান্টিনে খাওয়া হলো ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত। খুব যে আহামরি লাগল তা নয়। সাধারণ রান্না। আজকাল পূর্ব বাংলার রাঁধুনিরাও ঝাল দিতে ভুলে গেছে। পদ্মার ইলিশের চেয়ে এদিককার কোলাঘাটের গঙ্গার ইলিশের স্বাদ যে অনেক বেশি ভালো, তা শুনলে ওদিকে অনেকে চটে যায়। পদ্মায় অনেক বেশি ইলিশ পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাদে এদিককার গঙ্গার ইলিশ জিতে যায়।

পদ্মা পার হবার একটু পরেই আবার একটি নদী পার হতে হলো। আড়িয়াল খাঁ। আমার ছোটবেলার নদী! 'সে কেন দেখা দিল রে, না দেখা ছিল যে ভালো!' আমার চোখ জ্বালা করে উঠেছিল। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কী এক দুর্দান্ত, গর্জমান, অনবরত পাড়-ভাঙা নদীর ছবি থাকে স্মৃতিতে, তার বদলে এখন চুপচাপ বয়ে চলেছে নিরীহ, সাধারণ এক নদী। হয়তো আগেও এরকমই ছিল, বাল্যকালে সব কিছুই বড় বড় লাগে। ইস্কুলের মাঠটাকে মনে হয়

প্রকাণ্ড, বাড়ির পাশের দিঘিটার ওপারও যেন ছিল রহস্যময় জঙ্গলে ঢাকা, এক একটা রাস্তাকে মনে হতো অন্তহীন পথ। তা ছাড়া আড়িয়াল খাঁ-কে আমি হয়তো স্মৃতিতে ধরে রেখেছি ভরা বর্ষার সময়কার রূপে। এখন প্রবল গ্রীষ্ম, সব নদীই শীর্ণ। এবং আছে ফরাক্কা বাঁধের সমস্যা, যে-জন্য বাংলাদেশের নদীগুলিতে জল কম আসে। বাঁধ বেঁধে বেঁধে পৃথিবীর সব দেশের নদীগুলিই যৌবন হারিয়েছে। কলকাতার গঙ্গার মাঝখানে গ্রীষ্মকালে লোকে হেঁটে বেড়ায়, বেলুড়ের কাছে আমি নিজে দেখেছি।

রাস্তার ধারে ধারে গ্রাম ও শহরগুলির নাম লেখা। ফরিদপুর, মাদারিপুর পেরিয়ে গেলাম। একটা জায়গার নাম দেখে বুকটা ধক করে উঠেছিল একবার। ট্যাকের হাট! এর খুব কাছেই আমার মামাবাড়ি আমগ্রাম। ঐ মামাবাড়িতেই আমার প্রথম যৌন-উন্মেষ হয়েছিল। ঐখানে সাঁতার শিখি। যখন তখন ইজের আর গেঞ্জি খুলে নিয়ে ল্যাংটো হয়ে এক হাত উঁচু করে ধরে, আর এক হাতে সাঁতার কেটে খাল পার হয়া গেছি। ঐখানেই প্রথম সামনা সামনি দেখি মৃত্যু, আমার দাদামশাইয়ের। এখানেই প্রথম হাতে খড়ি। ওখানেই প্রথম দুর্গাপুজোর সময় পাঁঠা বলি দেখে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে আমি ছাদের এক কোণে এসে বসে কেঁদে ছিলাম।

গাড়িটা একটু ঘোরালেই আমার সেই মামার বাড়ি-আমবাগান-আটচালা-পুকুর এখন কী অবস্থায় আছে দেখে আসতে পারি। না, যাবো না, কিছুতেই যাবো না।

বিকেলের মধ্যে পৌঁছে গেলাম বরিশাল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বরিশাল শহরে আমাদের আগমন বার্তা রটে গেল, যদিও কারুকেই আগে থেকে খবর দেওয়া হয় নি। আত্মগোপন করে থাকা মুস্কিল। মিলন অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক, তাছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনে তার ধারাবাহিক অনুষ্ঠান হয়, সে নিজেও অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় সশরীরে। সুতরাং পাঠকদের কাছে তার মুখ বিশেষ পরিচিত। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, আমাকেও কেউ কেউ দেখেই চিনতে পেরে যায়।

পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। নিয়ম মাফিক আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের এস পি, পোলিং অফিসার কয়েকজনের কাছে খোঁজ খবর নিতে গেছি। এই সব আমলারাও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, আমি নিজে অবশ্য আপনার লেখা কিছু পড়িনি। কিন্তু আমার বউ আপনার ভক্ত, বাড়িতে আপনার বই আছে। আবার কেউ কেউ আমাদের অবাক করে দিয়ে আমার কবিতার দু'চার লাইন মুখস্থ বলে দেয়, কিংবা মিলনের কোনো উপন্যাসের কাহিনী।

সাংবাদিকদের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে পরদিন যেতে হলো স্থানীয় প্রেস ক্লাবে। অনেকেই বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে চান। তাতে কিছুতেই রাজি হই না। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এক বাড়িতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে আরও অনেক বাড়িতে যেতে হবে, তারপর বত্রিশ ব্যাঞ্জন খেতে খেতে প্রাণান্তকর অবস্থা হবে। বাংলাদেশের মানুষদের মতন এত অতিথিপরায়ণ মানুষ আর কোথাও দেখিনি।

বরিশাল শহরে হিন্দুদের সংখ্যা এখনো নগণ্য নয়। অশ্বিনী দত্ত এককালে ছিলেন বরিশালের মুকুটহীন রাজা। এখানকার টাউন হলটি এখনো তাঁর নামে। বরিশালের আর একজন স্বনামধন্য পুরুষ ফজলুল হক। ভারতীয় কংগ্রেস যদি এক সময় তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা না করতো, তা হলে বোধহয় এ উপমহাদেশের ইতিহাস অন্যরকম হতো।

এককালের সুখ্যাত ব্রজমোহন কলেজ বা বি এম কলেজ এখনো সগৌরবে চলছে। সম্প্রতি এই কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রস্তাব উঠেছে।

সন্ধেবেলা হোটেলের ঘরে বসে আড্ডা দিতে দিতে মিলন বললো, সুনীলদা, এই শহরে জীবনানন্দ দাশ কোন্ বাড়িতে থাকতেন, তা খুঁজে বার করলে হয় না?

মিলন কবিতা লেখে না, শুধুই গদ্যকার, কিন্তু অন্যান্য অনেক গদ্যকারের সঙ্গে তার তফাত এই যে সে খুব কবিতা ভালোবাসে। অনেক সময় তার সঙ্গে আমার গল্প-উপন্যাসের বদলে কবিতা নিয়েই কথা হয়।

বরিশালে এলে জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়বেই, তাঁর বাড়িটি দেখার ইচ্ছে আমারও মনে উঁকি দিয়েছিল।

আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি—শালিখ নিয়েছে নিঙরায়ে
নরম হলুদ পায়ে এই ঘাস ; এ সবুজ ঘাসের ভিতরে
সোঁদা ধুলো শুয়ে আছে—কাচের মতন পাখা এ ঘাসের গায়ে
ভোরেওফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে—শাদা স্তন ধরে
করবীর ঃ কোন্ এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল,
তাই দুখ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে ঃ নরম ব্যাকুল।

জিজ্ঞেস করলাম, সে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে কি এতদিন পর? ওঁদের কেউ তো এখানে নেই শুনেছি।

মিলন বললো, লোকাল কারুর সাহায্য নিতে হবে। শহরটা আমিও ভালো চিনি না।

পরদিন একজন সাংবাদিককে পাকড়াও করা হলো। সুবিধের মধ্যে এই যে, আমাদের সঙ্গে একটি গাড়ি আছে। পেট্রোলের চিন্তা নেই, এবং ড্রাইভার ভদ্রলোকটি গোমড়ামুখো নন। বরিশাল শহরের মধ্য দিয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে, তার নাম বগুড়া রোড। সেই রাস্তার এক বাঁকের মুখে খুঁজে পাওয়া গেল সেই বাড়ি। আশে পাশে বড় বড় হর্ম্য উঠে গেছে, কিন্তু এ বাড়িটি ছিমছাম একতলা। গেট পেরিয়ে ছোট্ট একটি উঠোন, অনেকটা বাগানের মতন, এদিকে ওদিকে কয়েকটি ঘর, পাকা দেওয়াল, ওপরে টালির ছাউনি। বাড়িটিতে এখনো বেশ একটা শান্তশ্রী আছে। বর্তমানে এক মুসলমান পরিবার এখানে থাকেন, তাঁরা যত্ন করে আমাদের দেখালেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে, এ বাড়ি একই রকম থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছুটা অদল বদল ও সংস্কার হয়েছে নিশ্চিত, কিন্তু একেবারে খোল নলচে বদলে যায় নি। একদিকের একটি ঘর দেখিয়ে একজন জানালেন যে সেটি প্রায় আগের মতনই আছে। কল্পনা করা যায়, জীবনানন্দ দাশ ঐ ঘরে বসে লিখতেন।

কত দিন তুমি আর আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর
খড়ের চালের নিচে, অন্ধকারে ঃ সন্ধ্যার ধূসর সজল
মৃদু হাত খেলিতেছে হিজল জামের ডালে ...

সে বাড়িতে আমরা বেশিক্ষণ থাকি নি। একটা বাড়ি অত দেখবার কী আছে? এক ঝলক দেখলে বেশি মনে থাকে।

গেটের পাশে সে বাড়ির নাম লেখা আছে 'ধানসিড়ি'। জীবনানন্দের আগের নয়, বর্তমান মালিকেরা এই নাম দিয়েছেন। তাঁরা ঐ কবির অনুরাগী।

তখন মনে হলো, তা হলে ধানসিড়ি নদীটাও খুঁজে দেখলে হয়। ঐ নামে সত্যি কোনো নদী আছে?

বরিশালের বেশ কয়েকজন তরুণ লেখক ও সাংবাদিক জানালো যে, ঐ নদী একটি নদী অবশ্যই আছে, তারা সবাই শুনেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তারা কেউ জানে না নদীটা ঠিক কোথায়, কেউ দেখে নি। দেখার আগ্রহও হয় নি?

ধানসিড়ি নামে একটি নদী আছে আসামে। ওখানে সুবনগিরি ধানসিড়ি এই রকম নদীর নাম হয়, কিন্তু বানান আলাদা। জীবনানন্দ লিখেছেন ধানসিড়ি, চন্দ্রবিন্দু দেন নি।

পৃথিবীর পথে ঘুরে বহু দিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাবো ব'য়ে
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে ...

জীবনানন্দ নিশ্চিত আসামের নদীটির কথা লেখেন নি, তাঁর নদীটি একান্তই বাংলার গ্রাম

নদী। এক নামে একাধিক নদী থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইছামতী ও যমুনা নামে বহু জায়গায় আলাদা আলাদা নদী আছে। বৈতরণী নামে নদীও একাধিক।

বরিশাল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে 'কীর্তনখোলা' নদী। বেশ নামটি। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁর কোনো কবিতায় 'কীর্তনখোলা' নামটি ব্যবহার করেননি, অথচ দূরবর্তী ধলেশ্বরীর কথা এসেছে বারেবার।

'কীর্তনখোলা' নদীটির রূপ উপভোগ করা যায় না। এককালে বরিশাল শহরটি নাকি সুন্দর ছিল, নদীর ধার দিয়ে বেড়াবার রাস্তা ছিল, এখন তা বোঝার উপায় নেই। নদীর ধারে কলকারখানা ও বড় বড় গুদামঘর নদীকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে, নদী দেখাই যায় না প্রায়। জনসংখ্যার চাপে শহরটি শ্রীহীন।

নির্বাচনের দিনটিতে আমাদের কাজ বিভিন্ন পোলিং বুথ ঘুরে ঘুরে দেখার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। কোথাও কোনো কারচুপি বা জোর জবরদস্তি চললে, বা সে রকম কোনো অভিযোগ শুনলে লিখে নিতে হবে। মোটামুটি নির্বিঘ্নেই ভোট চলছে, অনেক পোলিং বুথের সামনে লম্বা লাইন, সুতরাং আমাদের করনীয় তেমন কিছু নেই। আমি ও মিলন ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে খুঁজতে লাগলাম ধানসিড়ি নদীটি।

আগেকার বরিশাল এখন অনেক ভাগ হয়ে গেছে। মহকুমাগুলি এখন ছোট ছোট জেলা। যেসব ঝালকাঠি (উচ্চারণ ঃ ঝালোকাঠি), পটুয়াখালি এগুলোও এখন জেলা, সব মিলিয়ে এখনো বলা হয় বৃহত্তর বরিশাল। এই বৃহত্তর বরিশালেই আমাদের পরিদর্শন এলাকা। আমরা গাড়ি নিয়ে ঘুরছি অনবরত। শহরের ছেলেরা কেউ ধানসিড়ি নদীর সন্ধান দিতে পারে নি, আমরা যে-কোনো নদীতে খেয়া পার হবার সময় স্থানীয় লোকদের কাছে ধানসিড়ির খোঁজ খবর নিই। কেউই সঠিক কিছু বলতে পারে না।

ঝালকাঠির দিকে যাবার জন্য প্রায়ই আমাদের একটি নদী পার হতে হয়। এদিকের অনেক নদীর নামই বেশ সুন্দর। যেমন, একটি নদীর নাম সন্ধ্যা! কিন্তু এই নদীটির নাম মোটেই সুন্দর নয়, বরং অদ্ভুত, মানে বোঝা যায় না। ডাবখান! কেউ কেউ বললো, এটা নদী নয়, কাটা খাল, যদি তাও হয়, তা হলেই বা একটা খালের নাম ডাবখান হবে কেন? সমুদ্রের কাছাকাছি এই নদী-মাতৃক দেশে ডাব পাওয়া যায় সর্বত্র। এখানকার ডাবের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, বরং এখানকার সোনালি মর্তমান কলার স্বাদ অপূর্ব। কলা নয়, যেন ক্ষির।

যাই হোক, এই ডাবখান পারাপারের সময় একজন মাঝি জোর দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ধানসিড়ি নদী আছে ঐ তো ওদিকে। ওদিকে পানে অনেকগুলো নদী মিলেছে।

ডাবখান নদীর ধার দিয়ে বাঁধানো সড়ক নেই, মাঝিটি যেদিকটায় হাত তুলে দেখালো, সেদিকে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নৌকো ভাড়া নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু খেয়ার লঞ্চ ছাড়া শুধু যাত্রী পারাপারের জন্য খেয়ার নৌকোও আছে, সে নৌকো ভাড়া নেওয়া যাবে না। অন্য কোনো নৌকো নেই, বহু নৌকোই নির্বাচনের ডিউটি দিচ্ছে। কোনোক্রমেই কি ঐ অনেক নদীর সঙ্গম স্থানটিতে যাওয়া যাবে না? খেয়ার ঘাটে অন্যান্য লোকদের জিজ্ঞেস করলে সকলেই মাথা নেড়ে বলে, মুস্কিল, এখান থেকে যাওয়া খুব মুস্কিল। কেউ কেউ বিস্ময়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা অকিঞ্চিৎকর নদী দেখার জন্য আমাদের এই ব্যাকুলতার কারণ বুঝতে পারে না। কী আছে সেখানে?

তা হলে, ধানসিড়ি নদীটি জীবনানন্দের স্বকপোল কল্পিত নয়, একটা ঐ নামের বাস্তব নদী কাছে পিঠে আছে ঠিকই। সচরাচর যাতায়াতের পথে পড়ে না। ডাবখানের তীরে আমরা বেশি সময় কাটালে আমাদের সঙ্গী আনোয়ার বিনীতভাবে আমাদের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখনো অনেক পোলিং বুথ দেখা বাকি রয়ে গেছে। আমরা ফিরে যাই।

কিন্তু যদি মারামারি না হয়, বুথ দখল বা বোমা ছোঁড়ার ঘটনা না ঘটে, তাহলে আর দেখার কী আছে? ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে আমরা অন্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখে নিই। যেমন ফজলুল হকের বসতবাড়িটি দেখা হয়ে গেল। বেশ বড়, অনেকখানি ছড়ানো বাড়ি, এখনো বেশ সমৃদ্ধ অবস্থা

বোঝা যায়। সে বাড়ির একটি অংশে ফজলুল হকের ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে একটি সংগ্রামশালা করে রাখা হয়েছে। আমি ফজলুল হককে স্বচক্ষে দেখিনি। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের মতন চেহারাটিও যে বিশাল ছিল, তা তাঁর ব্যবহৃত চটি জুতো ও জল খাবার গেলাসের আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়।

ফজলুল হকের এক ছেলেও রাজনৈতিক নেতা, এবারের নির্বাচনে প্রার্থী। জীবনানন্দ দাশের ছেলে ও মেয়ে দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে, তাঁর বংশে আর কেউ নেই। ট্রামের ধাক্কায় জীবনানন্দ যখন নিহত হন, তখন কবি হিসেবে কজনই বা চিনতো তাঁকে। তাঁর বাড়িটি সংরক্ষণের কথা কেউ চিন্তা করে নি, এমনকি কলকাতাতেও কত শ্রেণি পেঁজি লোকের নামে রাস্তা আছে, জীবনানন্দ দাশের নামে কোনো রাস্তার নাম রাখা হয় নি। অন্তত ট্রাম কোম্পানি তো তাঁর স্মৃতি রক্ষার কোনো ব্যবস্থা করলে পারতো।

যেন চুম্বকের টানে আমরা ডাবখানের তীরে ফিরে যাই বারবার। ঝালকাঠির দিকে কী যেন গণ্ডগোল হচ্ছে, এই উড়োকথা শুনে আমরা নদী পেরিয়ে সেদিকে গেলাম তৃতীয় বার।

ধানসিড়ি নামে নদী আছে, এটা জেনেই আমি সন্তুষ্ট, কিন্তু মিলন নিরুদ্যম হতে রাজি নয়। তার বয়েস কম, জেদী স্বভাব, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, সে ধানসিড়ি আবিষ্কার করবেই। এক জায়গায় একটা ছোট দোকানে সিগারেট কেনার জন্য থেমেছি, মিলন সেখানেও জিজ্ঞেসবাদ শুরু করেছে। হঠাৎ একজন লোক বললো ধানসিড়ি যাবেন? এই পাশের সরু রাস্তাটা দিয়ে চলে যান না! মাইল দেড়েক যেতে হবে।

সে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবে? হ্যাঁ, যাওয়া যাবে অনেকখানি। এরকম একটা রাস্তা রয়েছে, তা আগে কেউ আমাদের বলেনি কেন? এ লোকটি কি সত্যি কথা বলছে? বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল নিয়ে এগোলাম সেই গ্রাম কাঁচা রাস্তা ধরে। শেষ পর্যন্ত রাস্তাটা এসে নামলো এক নদীর কিনারে। একটা ঘাটিয়ার ওপর কয়েকজন লোক বসেছিল, তাদের জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কী নদী? তারা বললো ধানসিড়ি!

এমন কিছু আহামরি রূপ নয় সে নদীর, তবু কেন নাম শোনা মাত্র রোমাঞ্চ হলো?

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়
সারাদিন কেটে যাবে কলসীর গন্ধে ভরা জলে ভেসে ভেসে ...

এককালে এই ধানসিড়ি তীরেও খেয়াঘাট ছিল, এখন ডাবখানের বুকে ফেরি লঞ্চ চলে, ওদিকে পাকা রাস্তা হয়ে গেছে, তাই এখানে বিশেষ কেউ আসে না। এক সময় এ নদীও বেশ চওড়া ছিল, এখন মজে গেছে, একদিকে চরা পড়ে যাওয়ায় সেদিকে উঁচু বাঁধ দেওয়া। তবু এখনো এই নদী নাব্য, কিছু নৌকো চলাচল করে।

নদীর ঘাটে দাঁড়ালেই কি নদীকে চেনা যায়? নদীর সঙ্গে একটা শারীরিক সম্পর্ক হওয়া দরকার। সাহেবরা সেই রকমই মনে করে। একবার জামশেদপুরের দিক থেকে সুবর্ণরেখা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে এসেছে নদীর ওপর, পশ্চিম আকাশের সূর্য থেকে সত্যিই অনেকগুলি সুবর্ণরেখা নেমে এসেছে জলে, আমরা প্রথাগত ভাবে মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছি, আমাদের সঙ্গী ছিলেন কবি আলেন গীনসবার্গ, তিনি প্যান্ট-সার্ট খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় নেমে গেলেন জলে। আর একবার এক জন বেলজিয়াম কবি ভ্যানব্যর ল্যামবায়সিকে নিয়ে কাকদ্বীপের দিকে বেড়াতে গিয়ে হারউড পয়েন্ট থেকে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় ভ্রমণ করছিলাম, মাঝ গঙ্গায় ভ্যানব্যর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। আমিও একবার, সেটা খুব সংগোপনে, মানসের জঙ্গলে মধ্যরাত্রিতে মানস নদী দেখে এমনই উতলা হয়েছিলাম, শরীর কাঁপছিল যৌন আবেগে, আর কেউ কোথথাও নেই, কপোলি জ্যোৎস্নায়

নদীটিকে মনে হয়েছিল নারী, সম্পূর্ণ পোশাক খুলে সাঁতার কাটার ছলে সঙ্গম করেছিলাম সেই নদীর সঙ্গে।

এখানে তা সম্ভব নয়। একটা নৌকো এসে থামতেই সেটি ভাড়া করা হলো। মাঝির নাম ফারুক, তার খালি গা, লোহা-পেটা শরীর। সঙ্গে একটা দশ-বারো বছরের বাচ্ছা ছেলে। ছেলেটি ওর নিজের নয়, অনাথ। আমরা কোথায় যাবো? কোথাও যাবো না, শুধু এই নদীতে কিছুক্ষণ ঘুরবো শুনে ফারুক চোখ ছোট করে তাকিয়ে রইলো।

এ নদীর প্রস্থ, বড়জোর বাগবাজারের খালের দেড়গুণ, কোনোদিকেই ধান খেত নেই। একদিকে গ্রাম। কিছু কিছু বাড়ি ও গাছপালা। 'কাঁঠাল-ছায়া' আছে কিনা বোঝা গেল না, অন্যদিকে বাঁধের ওপর বাবলা গাছের ঝাড় লাগানো হয়েছে। ঐ বাবলা গাছগুলি ফারুক মাঝির ঘোর অপছন্দ, তার ধারণা, ওর জন্য হাওয়া গরম হয়, বারবার বলতে লাগলো যা, হাওয়া গরম, দেখেন না ঘাম হচ্ছে, এ বাতাস ভালো নয়। অনাথ ছেলেটির জন্য ফারুকের খুব মায়া, নিজের গামছাটা এগিয়ে দিয়ে তাকে ঘাম মুছে নিতে বলে।

আমরা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য ফারুককে জিজ্ঞেস করি, তুমি ভোট দিতে যাবে না? সে বললো, আলবাৎ যাবো। ভোট নষ্ট করবো কেন? ভিড় কমুক, বিকেলে যাবো। সকালে গিয়ে লাইন দিলে রোজগার করবো কখন?

আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কাকে ভোট দেবে, ফারুক মিঞা?

সে চোখ ঘুরিয়ে বললো, আপনাদের বলবো কেন? আমার প্যাটের কথা কেউ জানতে পারবে না!

তার নৌকোর ছইতে এক নেত্রীর ছবি সাঁটা আছে। সেদিকে ইঙ্গিত করতে সে হি হি করে হেসে বললো, ছবি থাকলে চক্ষে ধুলো দেওয়া যায়। প্যাটের কথা তবু প্যাটেই থাকে।

বলাই বাহুল্য, ফারুকের মুখের ভাষা একেবারে অন্য রকম। সে ভাষা আমি বুঝলেও অবিকল লিপিবদ্ধ করা আমার সাধ্যাতীত। এই নিরক্ষর মাঝিটি তার গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন।

কথা বন্ধ করে আমি সতৃষ্ণ নয়নে নদীর দু'দিকে চেয়ে থাকি। এক কালে হয়তো এর ধারে ধারে ধান খেত ছিল। জীবনানন্দ কি কোনোদিন সত্যিই এই নদীর বুকে নৌকোয় ঘুরেছেন? কিংবা শহরের অন্য লোকদের মুখে শুধু নামটাই শুনেছেন।

নদীগুলো খুব বদলে যায়। ধানসিড়ি এখন একটি অতি অকিঞ্চিৎকর ছোট নদী। আমি কপোতাক্ষ নদীতেও নৌকো চেপেছি, তার জল এখন কোনো মৃত পাখির চোখের মতন বিবর্ণ।

ক্রমশ ধানসিড়ি চওড়া হয়। সামনের দিকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ জলরাশি। ফারুক জানালো যে ঐখানে সাতখানা নদী এসে মিশেছে, ওখানে গেলে ঘূর্ণিতে পড়তে হবে। সুতরাং আমরা আবার নৌকো ঘোরাতে বললাম।

এই নদীর নামটি জীবনানন্দের এমনই ভালো লেগে গিয়েছিল যে তিনি বেশ কয়েকটি কবিতায় এই ধানসিড়ির উল্লেখ করেছেন :

এ সব কবিতা আমি যখন লিখেছি ব'সে নিজ মনে একা ;
চালতার পাতা থেকে টুপটুপ্ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির :
কুয়াশায় স্থির হয়ে ছিল ম্লান ধানসিড়ি নদীটির তীর...

ফারুক মাঝির কথাবার্তা এমনই চিত্তাকর্ষক যে এর পর আমরা নদীটিকে ভুলে গিয়ে তার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিই। সে কবিতা কাকে বলে জানেই না। তবু সে বলে যে, যখন বাতাস থাকে না, তখনই বাবলা গাছগুলোর ভেতর থেকে গরম হাওয়া বেরিয়ে আসে...এই নদীর জল বড় গম্ভীর...ভোটের ঝগড়া ঝাঁটি শেষ না হলে বৃষ্টি ধারা নামবে না...ভোটের রেজাল্ট দেখার জন্য মেঘ চুপ করে বসে আছে...

এই ফারুককে নিয়ে কবিতা লেখা কত শক্ত!

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET